ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

স্বস্তিকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ।। ২৭ পৌষ, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ১২ জানুয়ারি, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামেও জঙ্গিদের জন্য টাকা আসছে

সংবাদদাতা ঃ সিউড়ী ।। বিদেশ থেকে সোজাসুজি জঙ্গি সংগঠনের জন্য টাকা আসছে বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামে। রাজ্যের অনুন্নত বা পিছিয়ে পড়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দাদের নামে জঙ্গি সংগঠনকে সাহায্য পাঠাচ্ছে আমেরিকাসহ আরব দেশগুলি। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা নজরদারি শুরু করেছে বলে বিশেষ সূত্রে জানা গেছে। শুধু টাকা পাঠানোই নয়, জেলার পিছিয়ে পড়া ব্লকের গ্রামের যে সমস্ত ব্লকগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত লাগোয়া মুরারই, রাজনগর, খয়রাশোল, নলহাটীসহ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংখ্যায় কম হলেও, নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে বিদেশ থেকে টাকা আসছে বলে গোয়েন্দাদের কাছে খবর।

জঙ্গি সংগঠনগুলিকে বিদেশী অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রে যে দেশগুলির নাম উঠে এসেছে তার মধ্যে রয়েছে আমেরিকার ফ্লোরিডা, আরব, কুয়েতসহ বেশ কয়েকটি

পশ্চিমবঙ্গে ধৃত জঙ্গি।

ব্যক্তিদের কাছে টাকা পাঠানো হচ্ছে, তাদের উপরই দায়িত্ব থাকছে সেই টাকা দেশের বিভিন্ন এলাকায় লুকিয়ে থাকা জঙ্গি সংগঠনের হাতে পৌঁছে দেওয়ার। এই টাকা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বড় নেটওয়ার্ক কাজ করছে সারা দেশ জুড়ে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, বীরভূমের ১৯টি ব্লকের মধ্যে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ড সীমান্ত লাগোয়া থানা ও ব্লকে ছড়িয়ে রয়েছে জঙ্গি সংগঠনগুলির নেটওয়ার্ক। জেলার দেশ। এইসব দেশ থেকে সোজাসুজি টাকা আসছে বীরভূমে। নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে আসা এই টাকা চেন সিস্টেমে চলে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। বর্তমানে দেশের প্রমুখ ছোট বড় শহরে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারি বেড়ে যাওয়ায়, পিছিয়ে পড়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষদের কাজে লাগাচ্ছে জঙ্গি সংগঠনগুলি। গ্রামের মানুষেরা সাধারণ ও নিরীহ। তাদেরকে

(এরপর ৪ পাতায়)

বিজেপিকে বাদ দিয়ে জোট

মমতা লোকসভায় সাফল্য পাবেন তো?

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মাস তিনেকের মধ্যেই সারা দেশে লোকসভা ভোটের দামামা বেজে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে এবারের লোকসভা ভোট নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পরবর্তী পর্যায়ে সিপিএমকে রাজ্য থেকে হঠিয়ে দেওয়ার বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিরোধী দলগুলির কীভাবে ভোট যুদ্ধে নামবে তার উপরই নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে সিপিএমকে কতটা অপ্রাসঙ্গিক করা যাবে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলগুলি একজোট হয়ে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করলেই এমন ঘটনা ঘটবে। তা অবশ্যই বিজেপিকে বাদ দিয়ে নয়। যারা এখনও মনে করছেন বিজেপিকে বাদ দিয়ে সিপিএমকে হারানো সম্ভব তারা কিন্তু মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন। কারণ, ২০০১ সালের বিধানসভার কথা নিশ্চয় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে আছে। সেবার শেষ মুহূর্তে এনডিএ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন মমতা। তাতে বিজেপি বেশ কিছু আসনে প্রার্থী দিয়ে দেয়। ফলাফলে দেখা দেয়, ৫৫টি বিধানসভা আসনে মমতা বিজেপির ভোট কাটার জন্য হেরে গিয়েছিলেন। তৃণমূল বিজেপি জোট সেবার হয়তো ক্ষমতায় চলে আসত। মমতার এক বগ্গা নীতির জন্য তা সম্ভব হয়নি।

আবার একই রাজনীতির পথ ধরেছেন তিনি। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনাও সেরেছেন কয়েক দফায়। মমতা এবারও সত্যব্রত মুখার্জীর নেতৃত্বাধীন বিজেপিকে বাদ দিয়ে জোটের পথে যেতে চাইছেন। জোট না হোক বিজেপির সঙ্গে কৌশলগত বোঝাপড়াতেও রাজি নন তিনি। অথচ তাঁর মনের ইচ্ছা, বিজেপি যেন কোনও গুরুত্বপূর্ণ বা সম্ভাবনাময় আসনে প্রার্থী না দেয়। তৃণমূলের মনে রাখা উচিত, বিজেপি একটি সর্বভারতীয় দল। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি লোকসভায় তার গড়ে এক লক্ষ ভোট আছে। গত পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির

মমতা ব্যানার্জী

একক সাফল্য বাম-শরিক আর এস পি-র চেয়েও বেশি। এরাজ্যে আর এস পি-র গোটা তিনেক এম পি আছে।

মমতা যদি বিজেপির সহযোগিতা চায়, তাহলে তাকেও বিজেপির জন্য বেশ কয়েকটি আসন ছাড়তে হবে। তা না হলে নিজের নাক কেটে তৃণমূলের যাত্রা ভঙ্গের পথে এবারও বিজেপিকে হাঁটতে হবে। একটা জাতীয় দল হিসাবে বিজেপির ৪২টি আসনে 'যোগ্যতর' প্রার্থী দাঁড় করানোর ক্ষমতা রয়েছে।

অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রীর মনে রাখা দরকার — এক সময়ে বিজেপি-র হাওয়াতেই পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের সীট কমে গেছিলো। তাই বিজেপি-কে বাদ দিয়ে কখনই সার্বিক বিরোধী ঐক্য হতে পারে না। বিজেপি সম্প্রতি বাঁকুড়ায় একটি স্কুলে একক প্রচেষ্টায় সমগ্র ম্যানেজিং কমিটি দখল করেছে। কাশ্মীরে ১ থেকে ১১ সীট হয়েছে। এর প্রভাব পড়বেই।

তৃণমূল নেত্রী সম্প্রতি মতুয়া

সত্যব্রত মুখার্জী

সম্প্রদায়কে নিজেদের দিকে আনার উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি নাকি বলেছেন মতুয়া সম্প্রদায়ের মাতা ঠাকুরাণী তাঁর নিজের মা! এর পূর্বে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু এবং প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস মতুয়াদের সভায় গেছিলেন। উভয়েরই উদ্দেশ্য হল ভোট। তৃণমূলের জনৈক নেতা বলেছেন যে দলীয় পতাকা ত্যাগ করে মতুয়াদের ধর্মসভায় যাবে! এসব কি একরকম সাম্প্রদায়িকতা নয়? তবে বিজেপি-কে সাম্প্রদায়িক অ্যাখ্যা দেওয়া হয় কেন? তৃণমূলনেত্রী এর আগে মুসলিমদের একসভায় বলেছেন, "আপনারা ৩৯ ভাগ, প্লিজ প্লিজ আমাদের ভোট দিন — ভোট দিলে সি পি এম সরকার দূর হয়ে যাবে।"

বাংলাদেশে হাসিনার জয়ে এখনই উল্লাসের কারণ নেই

গূঢ়পুরুষ ।। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে ইসলামি মৌলবাদী দুই জোট শরিক বি এন পি এবং জামাত-ই-ইসলামি দলের পরাজয় ভারতের পক্ষে মন্দের ভাল। বিগত ২০০১ সাল থেকে এই জোট বাংলাদেশে শাসন ক্ষমতায় ছিল। ক্ষমতায় আসার বছরেই বাংলাদেশ জুড়ে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালায় জামাতের ঘাতকরা। দেশভাগের সময় মুসলিম লিগের ঘাতক বাহিনীর নৃশংসতাকেও ২০০১-র হিন্দু নিধনকারী জামাতের অত্যাচার ছাড়িয়ে গেছে। দুঃখের বিষয় এই হিন্দু নিধন ও অত্যাচারের ঘটনা ভারতের সংবাদ মাধ্যম ধামা চাপা দেয়। যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর জামাতের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হলে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি নষ্ট হবে। তাই অত্যাচারের একটি লাইনও ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। একমাত্র সংসদে জাতি দাঙ্গা প্রতিরোধে বেগম জিয়ার সরকারের ব্যর্থতার নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র জামাতের হিন্দু নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশ করেছিল। বি এন পি-জামাত জোটের এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন বাংলাদেশের প্রতিবাদী সাংবাদিক সালাম আজাদ। বেগম জিয়ার সরকার সালাম আজাদকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করে। তাঁর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়। জামাত ঘোষণা করে সালাম আজাদের মুণ্ড এনে দিলে হত্যাকারীকে কোটি অঙ্কে অর্থ দেওয়া হবে। বিতাড়িত বাংলাদেশী সাংবাদিক কলকাতায় আশ্রয় নেন। এবং কলম থামান না। কলকাতায় বসে হিন্দু নির্যাতনের উপর কমপক্ষে ১৫টি বই এবং অসংখ্য প্রবন্ধ বাংলা ও ইংরেজিতে লেখেন। যেমন, "হিন্দু সম্প্রদায় কেন বাংলাদেশ ত্যাগ করছে? প্রকাশক-পুনশ্চ পাবলিসার্স। "অনুপ্রবেশ" ও "নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড"। প্রকাশক-মিত্র ও ঘোষ। ইংরেজিতে লিখেছেন "এথেনিক ক্লেনজিং" সহ মোট তিনটি বই। এই বইগুলি ছেপেছে দিল্লীর প্রকাশক বুকওয়েল।

বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলই কম বেশি হিন্দু বিরোধী। তাদের কাছে হিন্দু বিরোধিতা আর ভারত বিরোধিতা সমার্থক। তাই জামাতের মতো ইসলামি মৌলবাদী দলের আসন সংখ্যা ১৭ থেকে দুই হওয়া অথবা হাসিনার আওয়ামি লিগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এখনই উল্লসিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

বাংলাদেশের নির্বাচনে বি এন পি-জামাত জোটের ভরাডুবি হওয়ার পরেই কলকাতার বাংলাদেশী দূতাবাস চমকপ্রদ তৎপরতার সঙ্গে সালাম আজাদের বাজেয়াপ্ত পাসপোর্ট নবীকরণ করে ফেরৎ দেয় এবং জানায় যে বাংলাদেশে তিনি স্বাগত। এর থেকে বোঝা যায় যে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালা বদল সেখানে কিছুটা স্বস্তি নির্যাতিত হিন্দুদেরও দিয়েছে। কিন্তু এই শান্তি ও স্বস্তির মুক্ত হাওয়া কতদিন বইবে সেটাই এখন দেখার। বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলই কম বেশি হিন্দু বিরোধী। তাদের কাছে হিন্দু বিরোধিতা আর ভারত বিরোধিতা সমার্থক। তাই জামাতের মতো ইসলামি মৌলবাদী দলের আসন সংখ্যা ১৭ থেকে দুই হওয়া অথবা হাসিনার আওয়ামি লিগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এখনই উল্লসিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পরে অনেকেই ভেবেছিলেন যে ভারত পূর্ব সীমান্তে একটা বন্ধু প্রতিবেশী রাষ্ট্র পেল। কিন্তু বাস্তবে মোটেই তা হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি মুজিবর রহমান ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ "ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব চুক্তি" স্বাক্ষর করেছিলেন। এই চুক্তিতে ছিল যে ১৯৬৫ সালের "এনিমি প্রপার্টি (কাস্টডি এন্ড রেজিস্ট্রেশন)" আইনটি বাতিল করে হিন্দুদের বাজেয়াপ্ত জমি ও বাড়ি ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু এই কালা আইনটি মুজিব সরকার বাতিল করেনি। আজও তা বাংলাদেশে চালু আছে। মুজিব কন্যা হাসিনা ১৯৯৬-তে ক্ষমতায় আসার পর এই বিষয়ে বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুরা বহু আবেদন নিবেদন করেছিল। কিন্তু হাসিনা কর্ণপাত করেননি।

এমনটাই যে ঘটবে সে সম্পর্কে ভবিষ্যবাণী করেছিলেন পাক সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি। তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল নিয়াজি-র সামরিক উপদেষ্টা। ১৯৭১ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের পর তাঁকে যুদ্ধবন্দি হিসাবে বিমানে ভারতে নিয়ে আসার সময় তিনি ভারতীয় বিমান বাহিনীর অফিসারদের বলেছিলেন "যে বাঙালি মুসলমানদের মুক্তির জন্য আপনারা লড়াই করলেন, প্রাণ দিলেন, তারাই একদিন আপনাদের চরম শত্রু হবে। এরা ভারতীয় হিন্দুদের মনে প্রাণে ঘৃণা করে। মনে রাখবেন, এই বাঙালি মুসলমানরাই একদা পাকিস্তান গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল। এদের বিশ্বাস করলে ভারত ভুল করবে"। কথাটা যে মিথ্যা ছিল না তা পরে ভারতবাসী হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। তাই শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামি লিগের বিপুল জয়ে এখনই উল্লসিত হওয়ার কারণ নেই।

এই সময়

চিন্তিত কোর্ট

কলকাতা হাইকোর্টও রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। গত ২ জানুয়ারি উচ্চ আদালত রাজ্য সরকারের কাছে রাজ্যের নিরাপত্তার বিষয়ে সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা জানতে চায়। জনৈক এক ব্যক্তি রাইট টু ইনফরমেশন আইনে আদালতের দ্বারস্থ হলে, আদালত রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে জানতে চায়। বর্তমান সন্ত্রাসবাদী তান্ডবে রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে বিচারকেরাও যথেষ্ট চিন্তিত। তবে রাজ্য সরকার নিরাপত্তা বাড়িয়েছে বলে জানিয়েছে।

গুরু প্রীতি

২০০১ সালে ভারতীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদভবন আক্রমণের মূল পান্ডা মহম্মদ আফজল গুরুকে ফাঁসিতে না ঝোলানো যে, কংগ্রেসের সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত তা প্রকাশ পেয়ে গেল সদ্য অপসারিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলের মন্তব্যে। মুম্বাইয়ের ঔরঙ্গাবাদে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পাতিল বলেন, আফজল গুরুর ফাঁসি নিয়ে আপনারা চিন্তিত কেন? আরও তো ৩৫টি ফাইল বা কেস রয়েছে। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় রায় দিলেও কংগ্রেস যে তা কার্যকরী করবে না তা তিনি পরোক্ষে বুঝিয়ে দেন। এমনকী এ ব্যাপারে পার্টি যে তড়িঘড়ি কিছু করবে না তাও পাতিলের কথায় এদিন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কাঠগড়ায় পাক

পাকিস্তানের ভূমিকায় বিশ্বের অনেক দেশই অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে পাকিস্তানের তালিবানীদের ভূমিকা নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি করল। তালিবানী নেতা বায়াতুল্লা মাসুদ নির্লজ্জের মতোই জানিয়েছে, তারা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাকে সাহায্য করবে। পাক-সরকার এই মন্তব্যের কোনও বিরোধিতা করেনি, যা পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের কূট-কৌশলের ওপর জিজ্ঞাসা চিহ্ন দাঁড় করায়।

নামে পরিচয়

নেতার নামে নাম! বর্তমানে যখন নেতাদের ওপর মানুষের ভরসা উঠতে চলছে, তখন বিপরীত দৃশ্য দেখা গেল মধ্যপ্রদেশে। মধ্যপ্রদেশের পুনঃনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের নামে এক দম্পতি তাঁর পুত্র সন্তানের নামকরণ করেছেন 'শিবরাজ'। জববলপুর হাসপাতাল সূত্র অনুসারে, হনুমানতাল নিবাসী শ্রীমতী প্রীতি গৌহরিয়া তার পুত্রের নাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নামে নামকরণ করেছেন। এর কারণ হিসাবে তর পরিবার জানান, 'শিবরাজ সিং-এর বিজয় দিবস এই একই দিনে হওয়ায় নবজাতর নাম শিবরাজ রাখা হল।' এই শিবরাজও যাতে শিবরাজ সিং চৌহান হতে পারে এমনই আশা পরিবারের।

ঘুমের জয়

ঘুম! ঘুম নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অবসান নেই। সম্প্রতি একটি রিপোর্টে প্রকাশ গভীর ঘুম মানুষের সৃষ্টিশীল গুণ বাড়ায়। নিউইয়র্কের স্নায়ুবিজ্ঞানীরা একথা জানিয়েছেন। বর্তমান ব্যস্ততার যুগেও গভীর ঘুমের প্রয়োজন আছে বলে তাঁদের অভিমত। বিজ্ঞানীদের মতে গভীর ঘুম মানুষের স্মৃতি ও সৃষ্টিশীল গুণ বাড়ায়। গভীর ঘুম না হলে, তা পরোক্ষভাবে মস্তিষ্কের ক্ষতি করে। ঘুমের ব্যাঘাত হাইপোক্যামপাস কোষকে বাড়িয়ে দেয়, যা মস্তিষ্কের ওপর প্রভাব ফেলে। স্নায়ুবিজ্ঞানীদের এই রায়ে ঘুমপ্রেমীরা স্বাভাবিক ভাবেই খুশী।

নেপথ্যজাল

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া মুম্বাই বিস্ফোরণ তথা জঙ্গিহানার ঘটনা নিয়ে তদন্তে নেমে বেশ বিস্মৃত মুম্বাইয়ের এন্টি টেররিস্ট স্কোয়াড বা এ টি এস। তাদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, মোবাইল ফোন, হাওলা এবং দেশের অন্যান্য রাজ্যে সন্দেহভাজন ধৃত ব্যক্তিদের কছে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে দেখা গেছে, এক বিশাল চক্র এর পিছনে কাজ করছে যা দেশব্যাপী সক্রিয়। এমনকী জিজ্ঞাসাবাদের পর এ টি এস কর্তাদের বক্তব্য, শুধু মুম্বাইয়েই নয়, আরও বড় ধরনের হানা দিতে তারা যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাও তারা জানতে পেরেছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এ পর্যন্ত যারা তড়িঘড়ি জামিনে মুক্ত হয়েছে তারাও নকল পাসপোর্ট নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে।

অশনি সংকেত

বাংলাদেশে পালাবদল হয়েছে। মসনদে আওয়ামি লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের এই পালাবদলে কুখ্যাত জঙ্গিদের নিশানায় এখন পশ্চিমবঙ্গ। তারা গা ঢাকতে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে পারে বলে গোয়েন্দারা মনে করেছেন। হাসিনাও এই বিষয়ে চিন্তিত। তিনি বর্ডার সীল করে দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে বি এন পি- জমানার জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গ-কে তাদের নিরাপদ আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সজাগ থাকা উচিত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চে র উদ্যোগে ধর্মান্তরকরণের ষড়যন্ত্র বানচাল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কর্ণাটক, ওড়িশার পর এবার ঝাড়খন্ডেও খৃস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলো সাধারণ মানুষ। সংবাদ সূত্র অনুযায়ী, ঝাড়খন্ডের গিরিডি জেলায় দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে প্রত্যেক রবিবার ধর্মান্তরকরণের যে আয়োজন চলছিল তা চরম ধাক্কা খেল জনজাতিদেরই সংগঠিত বিরোধিতায়।

প্রসঙ্গত বিভিন্ন ধরনের সেবা, নানারকম প্রলোভন, রোগমুক্তি ইত্যাদির নামে দীর্ঘদিন ধরেই খৃস্টান মিশনারীরা ধর্মান্তরকরণ চালিয়ে আসছিল। ১৯৫৪ সালে নিয়োগী কমিশনের সমীক্ষার যে রিপোর্ট বেরিয়েছিল তাতেও এই ধর্মান্তরকরণ এবং তার কুপ্রভাব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল।

বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে এই ধর্মান্তরকরণের পরিণাম কী হয়েছে। সম্প্রতি কর্ণাটক এবং ওড়িশাতে এই ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে বিশাল জনরোষ তৈরি হয়েছে। এবার ঝাড়খন্ডেও সাধারণ মানুষ ধর্মান্তরকরণের এক ব্যাপক পরিকল্পনাকে পুরোপুরি ভেস্তে দিল।

ঝাড়খন্ড রাজ্যের হিন্দু জাগরণ মঞ্চে র প্রমুখ সুমন্ত কুমারের বক্তব্য, গত আগস্ট মাস থেকেই স্থানীয় চার্চ, কিছু রাজনৈতিক নেতার সমর্থনে ধীরজ সূর্যা নামে এক পাদ্রী নিজেকে যীশুবাবা নামে পরিচয় দিয়ে প্রতি রবিবারে ধর্মান্তরকরণের আয়োজন করতে থাকে। এক বোতল জলের সাহায্যে যীশুর কৃপায় রোগ সারানো এবং তারপর ধর্ম পরিবর্তনে উৎসাহ দেওয়ার কাজ সে করে আসছিল। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে চার্চগুলোতে রবিবার প্রার্থনা সভায় ডেকে ধর্ম পরিবর্তন করছিল। সাধারণ মানুষ এই প্রার্থনা বা চাঙ্গাই সভার বিরোধিতা করলেও স্থানীয় বিধায়ক সলমন সোরেন, ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার গিরিডি জেলার মুখপাত্র জয়নাথ রাণার সমর্থন থাকায় তা বিশেষ কার্যকরী হয়নি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে হিন্দু জাগরণ মঞ্চে র পক্ষ থেকে সুমন কুমার স্থানীয় পুলিশ এবং প্রশাসনকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন এবং তড়িঘড়ি সাংবাদিক সম্মেলন করে বিষয়টি প্রচারের আলোতে টেনে আনেন। তারপর গিরিডিসহ অন্যান্য স্থানেও জনজাতিদের মধ্যে শুরু হয় বিক্ষোভ বিরোধিতা এবং তার দুশ্চরিত্রের ব্যাপারে কানাঘুষো। শেষ পর্যন্ত জনজাতিসহ সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা এগিয়ে এসে মিশনারীদের বুজরুকির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন এবং প্রার্থনা সভার সংযোজক নন্দলাল সোরেনের বিরুদ্ধে ও অভিযোগ তোলেন যে, কেন সরল মানুষদের রোগ নিদানের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরকরণ করা হচ্ছে। প্রশাসনের উপরও চাপ সৃষ্টি করে তাদের এই ধরনের সভার অনুমতি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে সরব হন। ফলে গিরিডির এই চাঙ্গাই বা প্রার্থনা সভা বাধ্য হয়ে তুলে দিতে হয় পাদ্রীদের। এই ঘটনাকে সাধারণ মানুষের সচেতনাতা তথা রাষ্ট্রীয় চরিত্রের জাগরণ বলে উল্লেখ করেন সুমন কুমার। আগামী দিনে সমাজ তথা রাষ্ট্রের এই ধরনের বিপদে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ দেশের যে কোনও স্থানে সরব হবে বলে তিনি জানান।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নৈরাজ্যের রাজ্য

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে সরকার ও সরকারি প্রশাসনের পার্থক্যটা শুধু শব্দার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু। পশ্চিমবঙ্গে আজ এমন একটি সরকার রহিয়াছে, যাহার সহিত সরকারি কাজকর্মের কোনও মিল নাই। সরকার রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কার্যত ব্যর্থ এবং দেশের আইন যাহারা ভঙ্গ করিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অক্ষম। সর্বাপেক্ষা ন্যক্কারজনক বিষয় হইল, সরকারের ভাবনাচিন্তা ও কাজকর্ম দেখিয়া সন্দেহ হয় যে সংবিধানে মর্যাদা রক্ষার শপথ গ্রহণ করিয়াও সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবে আদালতের রায় কার্যকর করিতে রাজী নয়। অবশ্য শাসক জোটের বড় শরিকের মোড়লরা যে আদালতকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না, ইতিপূর্বে তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। কিন্তু এখন শুধু দল নয়, মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যসচিবসহ পুরো সরকারই ইহাতে সামিল হইয়াছে। এইকথা সকলেই জানেন যে গত ১৮ জুলাই, ২০০৮-এ কলকাতা হাইকোর্টে এক রায়ে ওই বছরের ৩১ ডিসেম্বরের পর হইতে টু-স্ট্রোক অটোরিক্সাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। রাজ্যের পরিবেশ দপ্তরের এক আবেদনের ভিত্তিতে উচ্চ আদালত এই রায় দিয়েছিলেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার উচ্চ আদালতের রায়কে শুধু অগ্রাহ্যই করিল না, নিজেদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিকেও রক্ষা করিতে অসমর্থ হইল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তাহার মুখ্যমন্ত্রী নির্লজ্জের মতো ব্যবহার করিতেছেন এবং নিজেদের ব্যর্থতার জন্য নিত্য নতুন অজুহাত খাড়া করিতেছেন।

সিটু সমর্থিত ইউনিয়নের সভায় নেতারা স্পষ্ট জানাইয়া দেয় যে আদালতের আদেশ যাই হউক না কেন, ১ জানুয়ারি হইতে তাহারা অটো চালাইবেন। সেই সভায় সিটুর রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী, রাজ্য সম্পাদক কালী ঘোষ, মন্ত্রী অনাদি সাহুসহ সিপিএমের বহু নেতাই উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, অটো ইউনিয়নগুলির সিংহভাগই সিপিএমের দখলে। ৩ জানুয়ারি অটোচালকদের তাণ্ডবে কলকাতার বহু এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা লইয়াছিল। তৃণমূল সমর্থিত অটো ইউনিয়নের বিক্ষোভ মিছিল চলাকালীন একদল দুস্কৃতী চার নম্বর ব্রিজ, পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং এবং সি আই টি রোডের লেডিজ পার্কের সামনে বাস হইতে যাত্রীদের টানিয়া নামাইয়া ভাঙচুর চালায়, বাসে আগুন ধরাইয়া দেয়। ওই দুস্কৃতীদের যে গোলমাল পাকাইতে শাসকদল মাঠে নামাইয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। পুলিশও নিষ্ক্রিয়। সরকার ও প্রশাসন ইহাই চাহিয়াছিল যে বেআইনি অটো বন্ধ করিতে গেলে কত বড় হাঙ্গামা বাধে তাহা আদালত প্রত্যক্ষ করুক। এমনকী মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেও প্রচ্ছন্ন মদত ছিল। দলীয় মুখপত্রের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে তাঁহার বক্তব্য — হঠাৎ করে বলব, সব অটো চলে যাও। এতগুলো ছেলে, তাদের জীবিকা চলবে কী করে?'

আর এক কথা। এই অটোগুলি পার্টি এবং পার্টি নেতাদের বিপুল কামাইয়ের উৎস। অটোচালকদের কাছ হইতে নিয়মিত তোলা বা চাঁদা আদায় তাহারা করিয়া থাকেন। আদালতের রায় মতো তাহারা তাই বেআইনি অটো বন্ধ করিবার চেষ্টা করে নাই। এই একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ স্রেফ কামিয়ে নেওয়ার জন্যেই বছর দশেক ধরিয়া এন সি টি ই-এর অনুমোদন ছাড়াই এরাজ্যে পি টি টি আই (প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সস্টিটিউট) গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। বাস্তবিক বামফ্রন্ট সরকার দাঁড়িয়েই আছে ঘুষ, দুর্নীতি, জোচ্চুরির উপর।

হাওড়া জেলে সাম্প্রতিক 'বন্দী বিদ্রোহের' ঘটনা প্রশাসনিক ব্যর্থতার আর এক উদাহরণ। বাম জমানায় জেলগুলির নতুন নামকরণ সংশোধনাগার হইলেও চরিত্রগত কোনও পরিবর্তনই হয় নাই। অপরাধীদের সংশোধন হওয়া তো দূরের কথা, এখন জেলখানাই যেন তাহাদের দুষ্কর্মের বড় আখড়া হইয়া উঠিয়াছে। জেলের মধ্যে মাদক হইতে শুরু করিয়া অস্ত্রশস্ত্র, মোবাইল ইত্যাদির নিয়মিত চালাচালি হয়। ইহা শুধু হাওড়া জেলের ঘটনা নয়, পশ্চিমবঙ্গের সব কয়টি জেলেরই একই চিত্র।

সম্প্রতি খিদিরপুরে বিষাক্ত মদ খাইয়া ২৭ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু আবার প্রমাণ করিল পশ্চিমবঙ্গে সরকার আছে, শাসন নেই। পুলিশ, দুস্কৃতী ও নেতাদের দুষ্ট চক্রই এই রাজ্যটাকে চলাইতেছে। শাসক-পার্টির আশ্রয়ে এবং প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের ব্যবসা বাম জমানায় অসম্ভব।

ইহা তো গেল সমস্যার একটি দিক। অন্য আরও একটি দিক লক্ষণীয় যে দুস্কৃতীরা যখন সরকারি সম্পত্তির ধ্বংস সাধন করিতেছে, আইন ভঙ্গ করিতেছে, পুলিশ তখন নীরব দর্শক। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সরকার তথা সরকারি প্রশাসনের ইহা চরম ব্যর্থতারই প্রমাণ। আদালতের আদেশ কার্যকর করিতে অনীহা এবং আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের সমুচিত দন্ড দিবার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা — দুইটি ক্ষেত্রে কারণ একই। সুষ্ঠু শাসনের পরিবর্তে সরকার সংকীর্ণ নির্বাচনী স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে। সরকারি প্রশাসনই যখন আদালতের রায় কার্যকর করিতে ব্যর্থ, তখন অপর আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তি দিবার নৈতিক অধিকারও তাহারা হারাইয়াছে। অর্থাৎ সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের এই রাজ্যে শাসন করিবার নৈতিক অধিকার আর নাই। আর ইহার ফলেই দেখা যাইতেছে, আইনের শাসনের বদলে রাস্তায় হিংসাশ্রয়ী গুন্ডারাই নিজেদের হাতে আইন তুলিয়া লইয়াছে।

ইদানীং প্রায় প্রত্যেকটি ইস্যুতেই সরকার ল্যাজে-গোবরে হইতেছে। সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনের প্রায় সব কয়টি ক্ষেত্রে গাফিলতি ও নৈরাজ্যের যে সূচনা বুদ্ধ দেববাবুর জমানায় শুরু হইয়াছিল, এখন তাহার চূড়ান্ত রূপ ক্রমশ স্পষ্ট হইতেছে।

সিঙ্গুরের কান্না

গোপীনাথ দে

সিঙ্গুর নিয়ে চাপান-উতোর অনেক হল। মোটর গাড়ির কারখানা গড়া নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মিটিং, মিছিল, অবস্থান বিক্ষোভ, রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ, রাজ্য সরকারের প্যাকেজ ঘোষণা ইত্যাদি অনেক হল। পশ্চিমবঙ্গের সরকার বাহাদুর নাকি ৯৯৭.৫ একর জমি অধিগ্রহণ করে টাটাদের দিয়েছেন। এর মধ্যে জমির দাম বাবদ চেক নেওয়া না নেওয়া বা ৪০০ একর জমি চাষিদের ফেরৎ দেওয়া বা বিকল্প জমি দেওয়ার প্রস্তাব — অনেক নেতা-নেত্রীর কথাও শুনলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরকার বাহাদুর ও টাটারা মিলে ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করে পুলিশ পোস্টিং করে যে এলাকাটা ঘিরে নেওয়া হল তা কি সত্য সত্যই ৯৯৭.৫ একর! নাকি বাস্তব পরিস্থিতি অন্য কিছু? স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে (বিশেষ করে বৃন্দাবন মণ্ডলের মতে) ওই ঘিরে ফেলা মোট জমির পরিমাণ ১১০০ একর বা তার কিছু বেশি। তাহলে ওই অতিরিক্ত ১০০ একর জমির কী হবে? এই অতিরিক্ত জমির দাম কী হবে? জমির মালিক দেবে কি —না, দিলে কি তার দাম হবে? ঘিরে ফেলার দরুণ কেনই বা তারা তাদের জমিতে যেতে পারবে না ইত্যাদি নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। তার জবাব কে দেবে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে জমির দাম নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্যাকেজ ঘোষণার পরে, জমির মালিকের মোট যে টাকাটা বিঘা পিছু পাবার সম্ভাবনা দেখা দিল তা হল তিন লক্ষ টাকার কিছু বেশি। অর্থাৎ এক বিঘা জমির দাম সর্ব মোট তিন লক্ষ টাকার কিছু বেশি। কিন্তু সরকার বাহাদুর সিঙ্গুরের জমির দাম আগে থেকেই বেঁধে দিয়েছেন। আর সেই দামটা সিঙ্গুরের রেজিস্ট্রেশন অফিসে রেজিস্ট্রার সাহেব ঠিক করে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। জমির দাম ঠিক করার পদ্ধতি হিসাবে রেজিস্ট্রার সাহেব বিগত শেষ তিন বছরের জমি কেনা-বেচার গড় নির্ণয় করে ঠিক করেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে সিঙ্গুরের ওই এলাকার জমির দাম বিঘা প্রতি দশ লক্ষ টাকা মাত্র। কাজে কাজেই সরকার বাহাদুর যদি প্যাকেজ ঘোষণা করে সর্বমোট তিন লক্ষ টাকার কিছু বেশীও দেন তবুও কৃষকদের যথেষ্ট পরিমাণে ঠকানো হচ্ছে না কি? তৃতীয় প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, একটা বড় কারখানা চালাতে প্রচুর জল লাগে। সিঙ্গুরের যেখানে কারখানা হচ্ছে সেখানে কোনও বড় নদী নেই। প্রস্তাবিত কারখানার অদূরে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে যদিও

> **“ঝাড়খণ্ড, বিহার, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি স্থান থেকে প্রচুর কৃষি শ্রমিকরা আসে এবং আলু বপন ও তোলার কাজ করে। ৩/৪ মাসে ছয় মাসের জীবিকা অর্জন করে ঘরে ফিরে যায়। সুতরাং এরূপ মূল্যবান কৃষি জমিকে অকৃষি জমিতে রূপান্তরিত করে কতটা লাভ হবে সেটা গভীরভাবে ভাবা উচিৎ ছিল।”**

একটি নদী "ঘিয়া" এবং আরো প্রায় চার কিলোমিটার দূরে "সরস্বতী" নদী আছে। কিন্তু দুটি নদীই মজে গিয়েছে। সারা বছর জল থাকে না। বর্ষাকালে কিছু বৃষ্টির জল জমে কিন্তু প্রবাহ থাকে না। ফলে সিঙ্গুরের কারখানার জন্য সব জলটুকুই ভূ-গর্ভস্থ জল দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। সারা বৎসর ধরে মাটির নিচের জল তুলে নিতে থাকলে মাটির নিচের জলস্তর অনেক নীচে নেমে যাবে। ফলে পাশাপাশি যেসব ব্লকগুলিতে বহু ফসলী জমি রয়েছে এবং বর্ষার সময় বাদে অন্য ঋতুতে চাষবাস হয় — ভূ-গর্ভস্থ জল, গভীর বা অগভীর নলকূপের সাহায্যে তুলে নিয়ে জমিতে সেচ দেয়। সেগুলি জলের অভাবে একফসলী জমিতে পরিণত হয়ে যাবে অর্থাৎ কেবলমাত্র বর্ষার উপর নির্ভর করে চাষ করতে হবে। সেখানে এবং পাশাপাশি ব্লকগুলির চাষিদের পেটে টান পড়বে। এই বিষয়টি কোনও নেতা বা নেত্রীর নজরে পড়ল না কেন তা বুঝলাম না। হুগলী জেলায় আর একটি মোটর কারখানা আছে — তার নাম, হিন্দমোটর। হিন্টমোটর-এর সুবিধা হল এই যে এই কারখানার কাছেই আছে বড় নদী — গঙ্গানদী। ফলে নদীর জলকে শোধন করে নিয়ে কাজে লাগানো হয় এবং কারখানার বর্জ্য পদার্থ ফেলার জন্যও ওই নদীকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সিঙ্গুরে মোটর গাড়ির কারখানার বর্জ্য পদার্থ ফেলার সেরকম কোনও সুযোগ নেই। ফলে গ্রামের পরিবেশ ক্রমেই দুর্বিষহ হতে থাকবে। বিশেষ করে অনুসারি শিল্পগুলি কি পরিমাণ দূষণ সৃষ্টি করবে তা আগাম ভাবা দরকার ছিল।

চতুর্থত, বিদ্যুৎ নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সিঙ্গুরের পাশপাশি কয়েকটা ব্লকের মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি সিঙ্গুরে যে কয়েকমাস টাটা কারখানার জন্য কাজ চলছিল অর্থাৎ বিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছিল ততদিন পাশাপাশি গ্রামগুলিতে প্রচণ্ড লোড্ সেডিং-এর দাপটে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ এবং কৃষি ক্ষেত্রে সেচের কাজে প্রচণ্ড বিঘ্ন ঘটেছিল। কিন্তু টাটারা চলে যাবার পর লোডসেডিং আছে ঠিকই তবে দাপটটা কমেছে। এবং তা দিয়েই বোঝা যায় বিদ্যুৎ উৎপাদন অপ্রতুল, উৎপাদিত বিদ্যুতের অনেকটাই টাটা কারখানা টেনেছে বলেই লোড্সেডিং বৃদ্ধি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জল ও বিদ্যুৎসহ অন্যান্য পরিকাঠামো এবং পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি নিয়ে সরকারের কোনও মাথা ব্যথা নেই।

সিঙ্গুর ব্লকের মোট কৃষিজমি ১০,৪৩৭ হেক্টর এবং সেচ সেবিত এলাকার জমি ১০,১৯১ হেক্টর। এর মধ্যে বহু ফসলি জমি

(এরপর ৪ পাতায়)

বাংলাদেশে পালাবদলে ভারতে ঢুকতে মরিয়া জঙ্গিরা

মহাবীর প্রসাদ টোডি ।। বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে মহাজোটের জয় যেমন স্বস্তিদায়ক তেমনি ভারতের কাছে মাথা-ব্যথার কারণও হয়েছে বলে আশঙ্কা। ভারতীয় গোয়েন্দাদের আশঙ্কা যে, খালেদা জিয়ার নির্বাচনে পরাজয়ে ওপারের সক্রিয় জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে পারে। গোয়েন্দারা জানিয়েছে যে, পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই বাংলাদেশের ডিরেক্টর জেনারেল অব ফোর্সেস ইনটেলিজেন্সকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে যাতে কোনওমতেই পাক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জঙ্গিরা শেখ হাসিনা সরকারের হাতে না পড়ে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানকে গোটা বিশ্বের কাছে জবাবদিহি করতে হবে বা হতে পারে। ইতিমধ্যে ভারতীয় গোয়েন্দারা এ ব্যাপারে বি এস এফ-কে সতর্ক করেছে। বি এস এফ এই কথা স্বীকার করে জানিয়েছে যে, সীমান্তে কড়া নজরদারি নিয়ে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রকাশ যে, বাংলাদেশের ভোটে খালেদা জিয়ার চার দলীয় জোটকে জেতানোর জন্য আই এস, আই এবং ডি জি এফ আইয়ের গোপন ছক ভারতীয় গোয়েন্দারা ভোটের আগেই জানতে পারেন। সে সময়েই গোয়েন্দারা জানান, ওই দুই গুপ্তচর সংস্থা মধ্যপ্রাচ্যের টাকার জোরে খালেদা জিয়ার জোটকে গদিতে বসানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কোনও কারণে চার দলীয় জোট পরাস্ত হলে প্রশিক্ষিত জঙ্গিদের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। ২০/২৫ জন কে এল ও জঙ্গির একটি দল উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্তগুলিতে ওঁৎ পেতে রয়েছে। চার দলীয় জোট পরাস্ত হলে তারা ভারতে ঢোকার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাবে বলে প্রকাশ। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্তে থ্রি ফেজ ফেন্সিংয়ের কাজ চলায় জায়গাগুলি উন্মুক্ত। ওই সব সীমান্ত দিয়ে ব্যাপক হারে চোরাচালান হচ্ছে। শেখ হাসিনার সরকারের হাত থেকে বাঁচতে জঙ্গিরা চোরাচালানের আড়ালে ভারতে ঢোকার কৌশল নিয়েছে।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে যে, ধৃত জঙ্গিদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার সম্ভাবনা আই এস আই এবং ডি জি এফ আইকে চিন্তায় ফেলেছে। পাশাপাশি কোটি কোটি টাকা খরচে চলা জঙ্গি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাটাও আই এস আইয়ের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোয়েন্দাদের দাবি, কোনও ঝুঁকি না নিয়ে প্রশিক্ষিত জঙ্গিদের ভারতে ঢুকিয়ে আত্মঘাতী হামলার কাজে লাগিয়ে দেওয়ার ব্লু-প্রিন্টও তৈরী রয়েছে।

বি এস এফের রায়গঞ্জ ও কিশানগঞ্জ সেক্টরের ডি আই জি, সঞ্জীব ভানোট এবং আর চন্দ্রভূষণ বলেন, অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কড়া নজরদারি রয়েছেই। সীমান্তের সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিকে জেলার তথ্যাভিজ্ঞ মহল এ অভিমত প্রকাশ করেছে যে, যেহেতু শেখ হাসিনা বলেছেন যে, প্রতিবেশী দেশগুলিতে হামলা চালাতে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না এবং বাংলাদেশের মাটিতে কোনও অবস্থাতেই জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়া হবে না। এছাড়া ভারতসহ সমস্ত প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলার পক্ষপাতী বলে তিনি জানিয়েছেন।

তাই একথা বলা যায় যে, আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসায় সীমান্ত পেরিয়ে জঙ্গি অনুপ্রবেশের আশঙ্কা অমূলক নয়। যদিও সীমান্তের সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে বলে প্রকাশ।

বিশ্বে পুঁজিবাদ ব্যর্থ— স্বদেশী ভাবনাই সফলতার একমাত্র পথ

ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে এন সি দে।। গত ২৬, ২৭, ২৮ ডিসেম্বর ২০০৮ -কর্ণাটক রাজ্যের আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ শহর ব্যাঙ্গালোরে হয়ে গেল স্বদেশী জাগরণ মঞ্চে র রাষ্ট্রীয় সভা। এই সভার মূল থিম ছিল "বিশ্ব পুঁজিবাদ ব্যর্থ — স্বদেশী পথই সফলতার একমাত্র পথ"। এই থিমকে সামনে রেখেই রাষ্ট্রীয় সভার উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বিচারপতি রামা জয়েস। তিনি বলেন, স্বদেশী আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন নয়। বর্তমানে প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন। এই আন্দোলনের ভিত্তি হবে স্বদেশী ভাবনা — এই স্বদেশী ভাবনা এবং স্বদেশী চিন্তাধারা গড়ে তোলা ও সংরক্ষণ করাটাই স্বদেশী জাগরণ মঞ্চে র কাজ। আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের কথা আছে, কিন্তু মৌলিক কর্তব্যের কথা নেই। স্বদেশী ভাবনা এবং বিচারধারা মৌলিক কর্তব্য হিসাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ। সুজাতা ওর্গের "হম করে রাষ্ট্র আরাধন" উদ্বোধনী সংগীতের মূর্চ্ছনা এবং রামা জয়েসের উদ্বোধনী ভাষণ যে আবেগময় স্বদেশী ভাবের পরিবেশ রচনা করে, তিন দিনের সভার সমস্ত কার্যসূচী সেই ধারাকেই অনুসরণ করে চলে।

নব নির্বাচিত অখিল ভারতীয় সঞ্চ ালক অরুণ ওঝা বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করে বলেন, "পুঁজিবাদী অর্থশাস্ত্রে এক নবীনতম অধ্যায় লেখার দায়িত্ব এসে পড়েছে হিন্দুস্থানের কাঁধে। এই দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা ও সম্পদ আমাদের আছে। যা দিয়ে আমরা এক নতুন অর্থশাস্ত্র রচনা করতেই পারি।"

এই নবীনতম অধ্যায়ে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চে র ভূমিকা স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি বলেন, "আজ আমাদের সংঘর্ষ সরকারের সঙ্গে, বড় পুঁজিপতিদের সঙ্গে, দেশী-বিদেশী বৃহৎ শোষক-পুঁজির সঙ্গে। আমরা বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ঃ "হে ঈশ্বর, আমরা আমাদের শেষ যুদ্ধে অবতীর্ণ, তুমি তো জানো, আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ, তাই আমাদের যাত্রাপথ তোমার আলোকে

রামা জয়েস

আলোকিত কর, যাতে আমরা বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি।"

এই সভার মঞ্চ থেকে রামা জয়েসের হাত দিয়ে তিনটি বইয়ের আবরণ উন্মোচন করা হয়। জগমোহন এবং এস গুরুমূর্তির লেখা বই দুটি পর্যালোচনার দাবি রাখে। শ্রীগুরুমূর্তি বইটিতে দেখিয়েছেন কীভাবে মার্কসবাদ গত ১০০ বছর ধরে পশ্চি মী দুনিয়ার ক্রিশ্চি য়ান সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে দলন করে শেষে কমিউনিস্ট দর্শনের অন্তর্নিহিত অন্তর্কলহে শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের ব্যক্তি ভিত্তিক মুক্ত বাজার অর্থনীতির মডেলও দেখা যাচ্ছে ধসে পড়ছে। এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে মুক্ত বাজার পুঁজিবাদের স্বাভাবিক পরিণতি চুক্তি ভিত্তিক জীবন পদ্ধ তি নয়, ভারতীয় সম্পর্ক ভিত্তিক আর্থিক মডেলই নিরন্তর সামাজিক আর্থিক ও রাজনৈতিক বিকাশের আদর্শ মডেল। মানব সমাজ বাজার ছাড়া অবস্থান করতে পারে না। কিন্তু কার্ল মার্কস এক বাজারহীন মানব সমাজের ভ্রান্ত স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন।

মুক্ত বাজার পুঁজিবাদের স্বাভাবিক পরিণতি চুক্তি ভিত্তিক জীবন পদ্ধ তি নয়, ভারতীয় সম্পর্ক ভিত্তিক আর্থিক মডেলই নিরন্তর সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক বিকাশের আদর্শ মডেল।

গুরুমূর্তি তাঁর দুটি ভাষণেই এই ভারতীয় মডেলকেই তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে আমেরিকা ও পাশ্চ াত্য দেশগুলি পরিবারপ্রথা ভেঙ্গে দিয়ে এক অসভ্য বর্বর ব্যক্তিবাদী সমাজ গড়ে তুলেছে। যেখানে মানুষ জঙ্গলের প্রাকৃতিক নিয়মেই জন্মায়, বড় হয়, ভোগ করে এবং মারা যায়। কারও জন্য রেখে যাওয়ার তাগিদ তাদের নেই, তাই সঞ্চ য় তাদের ধাতে নেই। সারা দেশটাই ধার করে খায়, তাই এক ক্রেডিট কার্ড ব্যবসায়ে অনাদায়ি ঋণই গোটা পাশ্চ াত্য দুনিয়ার অর্থনীতিকে ধসিয়ে দিয়েছে। আশ্চ র্যের কথা আমাদের অর্থনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কয়েক বছর আগে এই পাশ্চ াত্য পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের মডেলই ভারতের মানুষকে অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। আজ তিনিই ফ্যাসাদে পড়ে উল্টে া কথা বলছেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিপুল অর্থ দিয়ে লোকসভা নির্বাচনের আগে অর্থনীতিকে সামাল দিচ্ছেন। শ্রীগুরুমূর্তির কথায় ভারতীয় আদর্শ পরিবার প্রথাই ভারতীয় অর্থনীতিকে

গুরুমূর্তি

রক্ষা করেছে, করছে এবং চিরকালই করবে। আমাদের তাই এই ভারতীয় স্বদেশী পথই সফলতার একমাত্র পথ। সভার তিনটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রথমটি হল — বিশ্বায়ন রোখো, দেশ বাঁচাও;দ্বিতীয়টি হল — কৃষক বাঁচাও, কৃষি বাঁচাও এবং তৃতীয়টি হল — উন্নত দেশগুলির সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আলোচনা বন্ধ কর।

অরুণ ওঝার সমাপ্তি ভাষণের আগে পশ্চি ম বাংলা থেকে আগত প্রতিনিধি অশোক পাল চৌধুরীর "ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, গানটি বক্তা ও শ্রোতাদের আবেগপ্রবণ করে তোলে। তিনি ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনেন মেগাস্থিনিস আর আলবেরুণির উক্তি। যেখানে তারা আমাদের জন্মভূ মি ও ভারতবাসীর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেন, এই জন্মভূমিই আমাদের মাতৃভূমি। এই ভূমিই আমাদের মা, যার প্রাকৃতিক সুধা পান করে আমরা জীবন ধারণ করি। তার পাতা আঁচলের স্নিগ্ধ ছায়ায় আমরা বেড়ে ওঠি। এ আঁচল বিশ্ব মায়ের আঁচল। এদেশের মাটিতেই যেন চিরকাল মাথা ঠেকাতে পারি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাঙলার বঙ্কিমচন্দ্র মূর্ত হয়ে ওঠেছিলেন তাঁর 'বন্দে মাতরম্'-সংগীত-নাট্য-আলেখ্য আকারে পরিবেশন করেছিল কর্ণাটকের ছোট ছোট মেয়েরা।

তার আগে এক সুদৃশ্য, সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় প্রতিটি প্রদেশ তাদের প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসারী পোশাকে অংশগ্রহণ করে। মিছিল থেকে মুহুর্মুহু স্লোগান ওঠে — "দুধ-দহি কা দেশ মে ঃ পেপসি কোলা নহি চলেগা, নহি চলেগা", বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানী দেশ ছাড়ো "উন্নত দেশগুলোর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করা চলবে না", "স্বদেশী অর্থনীতি গ্রহণ কর, দেশ বাঁচাও" ইত্যাদি।

এর পরে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত একটি পার্কে মিলিত হয়। পথে হাজার হাজার মানুষ স্বাগত জানায়। পরে এক সভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত অর্থনীতির প্রফেসর কুমার স্বামী, কর্পোরেট জগতের খ্যাতনামা স্বদেশী পরামর্শদাতা এস গুরুমূর্তি প্রমুখ।

বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামেও টাকা আসছে

(১ পাতার পর)

সাধারণত কেউ সন্দেহ করে না। তাই তাদের বাড়ির ঠিকানায় বিদেশ থেকে টাকা আসছে বলে বিশেষ সূত্রে জানা গেছে।

যাদের নামে টাকা আসছে তারা জানাচ্ছে, তাদের যে আত্মীয় বিদেশে থাকে সে টাকা পাঠায়। জেলায় একটি নির্দিষ্ট সরকারি সংস্থা মারফৎ বিদেশ থেকে টাকা আসছে যা জঙ্গি সংগঠনের কাজে লাগছে। পুরুষ মানুষ ছাড়াও মহিলাদের নামে টাকা আসছে যাতে সন্দেহ তুলনামূলকভাবে কম হয়। বিদেশ থেকে কোড নাম্বারের সাহায্যে এই সমস্ত টাকার লেনদেন হচ্ছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দার নামে যা বিদেশী টাকা এসেছে তা কার্গিল যুদ্ধে র সময় বীরভূম থেকে বাংলাদেশ হয়ে পাকিস্থানে গেছে। সরকারি যে সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে বিদেশী সংগঠনগুলি ভারতে জঙ্গি কার্যকলাপে টাকা পাঠাচ্ছে, সেই সংস্থাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সতর্কও করেছে বলে জানা গেছে।

জেলার যে সমস্ত ব্লকের বাসিন্দাদের নামে টাকা আসছে, তাদের কাউকে মণিপুর, কাশ্মীর, মালদা, মুর্শিদাবাদ এমনকী মুম্বাই-এর নির্দিষ্ট জায়গায় ওই টাকা পৌঁছে দিতে হচ্ছে। বীরভূমের একটি চক্র মুর্শিদাবাদ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে টাকা পৌঁছে দিচ্ছে যা সেখান থেকে পাকিস্তান চলে যাচ্ছে। জেলার যে গ্রামগুলিতে জঙ্গি সংগঠনগুলি নেটওয়ার্ক ছড়িয়েছে, সেই গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্টই খারাপ।

হেমন্ত কুমার বর্মা উত্তরবঙ্গের প্রান্ত সঙ্ঘচালক পুনর্নির্বাচিত

সংবাদদাতা ।। সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজীর উত্তরবঙ্গে স্বয়ংসেবক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এক কার্যকর্তা বৈঠকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গের প্রান্ত সঙ্ঘচালক পুনর্নির্বাচিত হলেন হেমন্তকুমার বর্মা। ২৫ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গের প্রান্ত প্রতিনিধিরা কুচবিহার জেলার পুন্ডিবাড়ী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হেমন্ত কুমার বর্মাকে নির্বাচিত করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংবিধান অনুযায়ী প্রতি তিন বছর অন্তর প্রান্ত সঙ্ঘচালক নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সেই সূত্র ধরেই তিনি আগামী তিন বছরের জন্য এই দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন এবং সেই সঙ্গে নতুন প্রান্ত কার্যকারিণী গঠিত হয়েছে। এই কার্যকরী মণ্ডলে রয়েছেন — প্রান্ত সঙ্ঘচালক — হেমন্ত কুমার বর্মা, প্রান্ত কার্যবাহ — বিদ্রোহী কুমার সরকার, প্রান্ত প্রচারক — অদ্বৈত চরণ দত্ত, সহ প্রান্ত প্রচারক — গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ, বৌদ্ধি ক প্রমুখ — প্রবীর কুমার মিত্র, শারীরিক প্রমুখ — বুদ্ধ দেব মণ্ডল, সেবা প্রমুখ — গৌতম সরকার, ব্যবস্থা প্রমুখ — কে পি আগরওয়াল, সহ ব্যবস্থা প্রমুখ — তপন কুমার দাস, সম্পর্ক প্রমুখ — উদয় শঙ্কর সরকার, প্রচার প্রমুখ — দেবাশীষ লালা, কার্যালয় প্রমুখ বিজন কুমার বর্মন। কার্যকারিণী সদস্য — অজিত কুমার পাল, তারানিধি নেপাল, শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল, প্রদীপ অধিকারী। আমন্ত্রিত সদস্য — রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক ও স্বরূপ চ্যাটার্জী।

সিঙ্গুরের কান্না

(৩ পাতার পর)

৯০৯৭ হেক্টর। সিঙ্গুরে প্রতি হেক্টর জমিতে বোরো চাল উৎপন্ন হয় ২৬৫৯ কেজি এবং আলু উৎপন্ন হয় ২৬,৬০৪ কেজি। যা নাকি রেকর্ড ফলন। তাই বলা যায় ভারতের সবচেয়ে উর্বর কৃষিজমির অন্যতম এই সিঙ্গুরের কৃষি জমি। কৃষি উৎপাদনের নিবিড়তা, রাজ্যের গড় যেখানে ১৮২ শতাংশ সেখানে সিঙ্গুরের কৃষি উৎপাদনের নিবিড়তা ২২০ শতাংশ।

আলু চাষের সময় প্রচুর কৃষি শ্রমিক প্রয়োজন হয়। এবং এই কৃষি শ্রমিকের প্রয়োজন মেটানোর জন্য দূর-দূরান্ত থেকে কৃষি শ্রমিকরা সিঙ্গুরে আসে কাজের সন্ধানে। ঝাড়খণ্ড, বিহার, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি স্থান থেকে প্রচুর কৃষি শ্রমিকরা আসে এবং আলু বপন ও তোলার কাজ করে। ৩/৪ মাসে ছয় মাসের জীবিকা অর্জন করে যে যার ঘরে ফিরে যায়। সুতরাং এরূপ মূল্যবান কৃষি জমিকে অকৃষি জমিতে রূপান্তরিত করে কতটা লাভ হবে সেটা গভীরভাবে ভাবা উচিৎ ছিল।

সাঁতুড়ির মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধের মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। পুরুলিয়ার সাঁতুড়ি এলাকার মেয়েদের পড়াশোনা কার্যত শিকেয় ওঠার মুখে। জেলার ঢেঁকশিলা স্কুলের সামনে গজিয়ে উঠেছে অবৈধ মদের ব্যবসা। চলছে রমরমিয়ে মদের কারবার। ফলে স্কুল ছাত্রদের তুলনায় মেয়েরাই বেশি অসুবিধার মুখে পড়েছে। ইতিমধ্যেই অনেক মেয়ের লেখাপড়া বন্ধের মুখে। মা-বাবাও মেয়ের সুরক্ষার কথা ভেবে স্কুলে পাঠাতে চাইছেন না। দুস্কৃতীদের বেশির ভাগই রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট হওয়ায় স্থানীয় মানুষ থানায় অভিযোগ জানালেও কাজের কাজ কিছু হয়নি।

স্কুল-ছাত্রীদের প্রতি মাতালরা অশালীন ইঙ্গিত ও মন্তব্য করায়, ছাত্রীরা নিজেরাই লজ্জায় স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে চলতি পাঠ্যসূচী থেকেও তারা পিছিয়ে যাচ্ছে। স্কুলের এক ছাত্রীর মতে, "ওরা আমাদের দেখলেই অশালীন কথা-বার্তা বলে। আমাদের স্কুল যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও স্কুলে আসতে পারছি না। এখন স্কুল আসাটাই আমাদের কাছে আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

এই ঘটনায় প্রধান শিক্ষক অঞ্চ লের স্কুল-ইন্সপেক্টরকে লিখিতভাবে সবকিছু জানিয়েছেন। তবে সমস্যার মোকাবিলায় প্রধান শিক্ষকও এখনও পর্যন্ত কোনও আশার আলো দেখতে পাননি। এদিকে সাঁতুড়ির মেয়েদের ঘরের মেয়ে ঘরেই বসে থাকার উপক্রম দেখা দিয়েছে।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মন্তব্য

টাটাদের আর্থিক সুবিধা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্যায় করেছে

২০০৮-এর শেষ দিকেএক সেমিনারে নোবেল বিজয়ী শ্রী অমর্ত্য সেন তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে, টাটারা এতো ধনী যারা বৃটিশ ইস্পাত কারখানা কিনতে পারে। তাদেরকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থিক সুবিধা দিয়ে অন্যায় করেছে। টাটাদের সঙ্গে ডিল ঠিক ছিল না। পরোক্ষে তিনি বলেন যে, টাটাদের খোশামোদ (!) করা হয়েছে। তিনি আরও

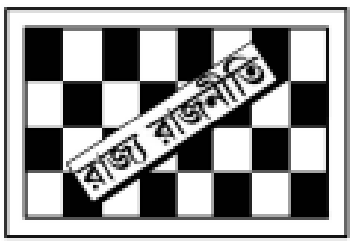

নিশাকর সোম

বলেছেন, শিল্পায়নের ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়া দরকার। সমস্ত রকম আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই ঐকমত্য করা উচিত ছিল। রাজ্যের উন্নতি কেবলমাত্র একটি দলের বা সরকারের দায়িত্ব নয়। সকল স্তরের সহানুভূতি দরকার। অমর্ত্য সেনের এই থাপ্পড় খেয়ে বুদ্ধ-নিরুপম কী শিক্ষা লাভ করবেন? আসলে বুদ্ধ-নিরুপমের — বিশেষ করে শেষদিকে বুদ্ধ বাবুর রাজভবনের প্রস্তাবে ঐক্যমত্য হওয়া নিয়ে পার্টির মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছিল। এ বিষয়ে বুদ্ধ-নিরুপম দুই মেরুতে। নিরুপম নাকি ক্ষুব্ধ হয়ে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন?

আসলে টাটার ব্যাপারে পার্টি, বামফ্রন্ট, বামফ্রন্টের শরিকদের এমনকী পার্টি নেতৃত্ব ও মন্ত্রিসভাকে অন্ধকারে রেখে বুদ্ধ নিরুপম-এর টাটা চুক্তি করাতে বিরোধী তথা বাম শরিকদের মধ্যে শুধু প্রশ্ন এসেছিল তাই নয়, সমগ্র জনগণও স্বচ্ছতার অভাব মনে করতে শুরু করেছিল। দাম্ভিক বুদ্ধ -নিরুপম রাজ্যটাকে কি টাটাদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। টাটাদের সঙ্গে তাঁদের দায়বদ্ধ তার কারণটা কি? এটা জানা যাবে না!

একটা প্রচলিত লোক-প্রবাদ হল কীর্তি-র্যস্য স জীবতি। এই বাক্য-কে অনুসরণ করে এ-রাজ্যের কীর্তিমান মন্ত্রী "শ্রীকৃষ্ণ'-এর বরপুত্র একটি পর একটি কীর্তি স্থাপন করে চলেছেন। সম্প্রতি রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তর আলো-ধ্বনির মারফৎ একটি চমকদার শো করেছে। তাতে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু-কে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ-এর সঙ্গে এক করে দেখানো হয়েছে। স্মরণ করা দরকার, সুভাষচন্দ্রকে কুইসলিং (দেশ বিক্রয়কারী) এই অভিধায় অভিহিত করেছিল। আর কমিউনিস্ট নেতা প্রয়াত ভবানী সেন — রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামের আড়ালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে "বুর্জোয়া কবি" বলে আখ্যাত করেছিলেন। (বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। প্রসঙ্গত রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি রবীন্দ্র মেলা ইত্যাদি করে কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করেছিল। তখন কমিউনিস্ট এক বুদ্ধিজীবী নেতা চিনমোহন সেহানবীশ আমায় হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথকে আমরা ক্যান্ডিডেট মেম্বার করলাম।" আজকের এ-রাজ্যের নেতারা এসব কিছুই জানেন না। আর ভয়াবহ কান্ড ঘটেছে — পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তর একটি রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। তার বিষয় বস্তু হল : ক্ষুদিরামের সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদ। অর্থাৎ ক্ষুদিরাম সন্ত্রাসবাদী!

আলো-ধ্বনিতে টাকা নষ্ট করে "শ্রীকৃষ্ণ"-কে নেতাজী রবীন্দ্রনাথ-এর সমান না করে রাজ্যের ক্রীড়ার উন্নতি সাধন করলে রাজ্য-ক্রীড়াবিদ-ক্রীড়ানুরাগীগণ কৃতার্থ হত। এ রাজ্যে হকির জন্য অ্যাসট্রো টার্ফ তৈরি করা হল না অথচ জমি নির্ধারিত ছিল। ঝাড়খণ্ড রাজ্য করে ফেললো। সাইকেল প্রতিযোগিতার বিশেষ মাঠ তৈরি করার জন্য জমি থাকলেও তা গড়া হল না। শোনা যায়, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে এ-সব বন্ধ করে দিল ক্রীড়া দপ্তর।

ক্রীড়া মন্ত্রী রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে স্থান পেয়েই উত্তর ২৪ পরগণায় তাঁর বিরোধী গোষ্ঠী — অমিতাভ নন্দী গোষ্ঠীকে পার্টি থেকে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ইতিমধ্যে হাবড়া লোকালের অমিতাভ গোষ্ঠীর লোকজনদের বহিষ্কার করার প্রতিবাদে কয়েকশত পার্টি-সদস্য পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছে। এই নিয়ে রাজ্য-সম্পাদক চিন্তিত। এ সম্বন্ধে পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাতের উপস্থিতিতে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বিশেষ সভায় আলোচনা হওয়ার কথা ছিল।

সম্প্রতি কয়েক লক্ষ টাকা (নাকি কোটি?) ব্যয় করে ক্রীড়ামন্ত্রী ও ক্রীড়াদপ্তরের একটি বিদেশে প্রমোদ ভ্রমণ করে এলেন! এ সম্বন্ধে বিরোধী দলগুলি নিশ্চুপ কেন? সুভাষ চক্রবর্তী সম্পর্কে তাঁদের দুর্বলতা কোথায় এবং কেন?

সিপিএম দলে এখন নেতৃত্বের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেই প্রাণহানির ভয় দেখানো হচ্ছে। তাই বহু সৎকর্মী বসে যাচ্ছেন। লোকসভা নির্বাচনে এর প্রতিফলন পড়বেই।

সম্প্রতি সিপিএম-এর কোনও একটি কার্যালয়ের পাসে চাকরীর জন্য মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকা পাওয়া গেছে। এই তালিকায় ৬৫টি নাম নাকি আছে — সবগুলিই সিপিএম-এর নেতা-নেত্রীদের স্ত্রী-স্বামী, পুত্র, আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ কক্াসদের নাম শোভা পাচ্ছে! এই কলামের পূর্বেই লেখা হয়েছিল যে সিপিএম নেতারা নিজেদের স্বার্থ এবং গোষ্ঠীস্বার্থ ছাড়া কিছুই দেখেন না। এমনকী দুঃস্থ পার্টি-সদস্য কর্মীদের কথা মোটেই ভাবেন না। এ ব্যাপারে জনৈক সাংসদ-এর রেকর্ড সব থেকে উজ্জ্বল! সিপিএম এখন করে খাওয়ার পার্টিতে পরিণত হয়েছে।

অন্য রকম

স্যাক্রিফাইস্

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ৩০ বছরের রাজারাম আজ গর্বিত। গর্বিত তাঁর গ্রামবাসীরাও। রাজারামের দেশভক্তি এখন অন্যদের প্রেরণা যোগাচ্ছে। দেশের জন্য কিছু করতে পেরে সেও আনন্দিত। তামিলনাড়ুর ধরমপুরি জেলার পাপ্পিরেড্ডি পট্টি গ্রামের বাসিন্দা রাজারাম। তবে এসব একদিনে হয়নি। দীর্ঘ সাধনার ফসল।

তারই বয়সের ছেলেরা যখন বলিউড নিয়ে মদমত্ত কিংবা মোবাইলে সময় কাটাতে ব্যস্ত, তখন রাজারাম ছিল এসব ভাবনা থেকে শতহস্ত দূরে। সে শুধুই দেশের কথা ভাবত। ভাবত দেশমাতার জন্য মন্দির তৈরির কথা। রাজারামের সাধ ছিল, ছিল না শুধু সাধ্য। দেশভক্তি থাকলে নিশ্চয় উপায় বেরিয়ে আসবে — এই বিশ্বাসেই সে এগিয়ে গেছে। স্বপ্ন দেখেছে। সরে আসেনি সংকল্প থেকে। মন্দিরের খরচ বহন করার মতো আর্থিক সামর্থ্য তার ছিল না। তবুও সে আশাহত হয়নি। রাজারামের এ স্বপ্ন মাথায় আসে ২০০১-এ। স্বাধীনতা সংগ্রামী সুব্রমনিয়া সিবা-র জীবনী পড়তে পড়তে অনুপ্রাণিত হয় সে। মনস্থির করে বিপ্লবীর অসম্পন্ন কাজ সে সফল করবে। বিপ্লবী সিবারও স্বপ্ন ছিল তামিলনাড়ুতে ভারতমাতার মন্দির তৈরির। ভারতমাতার মন্দির নির্মাণে তিনি অনেকটা এগিয়েছিলেন। তখন ১৯২৩ সালে। ১৯২৫ এ কারাবাস থেকে মুক্তির পর পাকাপাকি ভাবে মন্দির তৈরির কাজে হাত দেন। কিন্তু স্বপ্ন পূরণ হল না। ওই বছরেই মারা গেলেন তিনি। তাঁর জীবনী প্রেরণা যোগায় রাজারামকে। রাজারাম মনে মনে ঠিক করল, মন্দির তৈরি করতে হবে।

বাড়ির লোকে বাধ্য হয়ে বারণ করল তারা অসহায়। এত টাকা রাজারাম পাবে কোথায় — এই দুশ্চিন্তা তাঁর পরিবারকেও অস্বস্তিতে ফেলল। রাজারাম একটা ফান্ড তৈরি করল। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। শেষমেষ সে নিজের ভাড়া নেওয়া সাইকেল দোকানটাকেই বিক্রি করে দেওয়ার কথা ভাবল। মন্দিরের খরচ যোগাতে বিক্রি করে দিল তাঁর ভবিষ্যৎ একমাত্র সম্বল সাইকেল দোকানটিকে। পরিবারের খরচ যোগাতে শুরু করল সাইকেল সারানোর কাজ। একদিকে পরিবার, অন্যদিকে মন্দির। দুই-এর জন্যই রোজগার। সংগ্রহ করতে হবে প্রয়োজনীয় অর্থ। এমন সময় পাশে দাঁড়ালেন তাঁর দুই বন্ধু। একজন মুসলিম। অন্যজন খৃস্টান। তাতে কী! ভারতমাতা সবার জন্য। সবার ওপরে দেশ — ভারতমাতা — এই আদর্শে তারাও হাত বাড়াল। শুরু হল মন্দিরের কাজ। প্রতিষ্ঠিত হল দেশমাতৃকার মন্দির। ৪ ফুটের ভারতমাতার বিগ্রহ। রাজারামের মতে, 'এই মন্দির সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষের জন্য। এ মন্দির সবার জন্য।' তাঁর কাছে ভারতমাতা কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতীক নয়। কোনও নেতাকে সে আহ্বান জানায়নি। নেতা-নেত্রী ছাড়াই প্রতিষ্ঠা পেল ভারতমাতা। জয়ধ্বনি উঠল দেশমাতার নামে। ভারতমাতা কী জয়!

শিশু শ্রমিকদের পুনর্বাসনে রাজ্যে প্রথম টাস্ক ফোর্স উত্তর দিনাজপুরে

মহাবীরপ্রসাদ টোডি ।। শিশুশ্রম রুখতে এবং শিশুশ্রমিকদের পুনর্বাসনে রাজ্যে প্রথম বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন হল উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। জেলা শ্রম দপ্তর, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গত ২৬ ডিসেম্বর রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় টাস্ক- ফোর্সের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসন এবং ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার প্রোজেক্ট (এন সি এল পি) সূত্রে জানা গেছে যে, ওই বৈঠকে জেলার শিশু শ্রমিকদের উদ্ধার ও পুনর্বাসনে মাস্টার প্ল্যান তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে শিশু শ্রমিকদের আবাসিক স্কুলের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

নতুন গঠিত টাস্ক ফোর্সের দাবি, শীঘ্রই জেলা জুড়ে অভিযানে নামা হবে, যারা শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ করছে তাদের বিরুদ্ধে ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যদিও জেলার ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, অতীতেও ঘটা করে শিশুশ্রম রোধে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা সত্ত্বেও সরকারি হিসাবে জেলায় বর্তমানে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। যার মধ্যে প্রায় ২০ হাজার শিশু শ্রমিক বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

টাস্ক-ফোর্সের তরফে সমস্যার কথা স্বীকার করে শীঘ্রই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে,প্রায় এক বছর আগে ইসলামপুরে শিশু শ্রমিকদের আবাসিক স্কুল চালু করা হয়। সেখানে ৫০টি

শয্যার অনুমোদন থাকলেও এখনও পর্যন্ত মাত্র ১৫ জনের থাকার ব্যবস্থা করা গিয়েছে।

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে যে, পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যা রয়েছে। তাই জেলায় শিশুশ্রম আটকানো যাচ্ছে না। তবে সমস্যা মেটাতে টাস্কফোর্সে-র মাধ্যমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুশ্রমের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে জেলা জুড়ে লিফলেট ছড়ানো হবে ও ট্যাবলো বের করা হবে। প্রতিটি হোটেল, রেস্তরাঁসহ বিভিন্ন দোকানে শিশুশ্রম যে বেআইনি সেই বিষয়ে নোটিস ঝোলানো বাধ্যতামূলক করা হবে। সেখানে সংশ্লিষ্ট মালিকদের লিখতে হবে, "এখানে কোনও শিশু শ্রমিক কাজ করে না।"

অতিরিক্ত জেলাশাসক জয়দেব সাহা বলেন, শিশুশ্রমিক নিয়োগ করলে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে টাস্ক ফোর্স জরিমানাসহ কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান সুশীল গোস্বামী বলেন, পুনর্বাসনের সেরকম ব্যবস্থা না থাকার কারণে শিশুশ্রম বন্ধ করা যাচ্ছেনা। টাস্ক ফোর্স শীঘ্রই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজে নামবে। জেলা এন সি এল ডিরেক্টর ও সহকারী শ্রম আধিকারিক যথাক্রমে দীপঙ্কর চক্রবর্তী ও বিতান দে স্বীকার করেছেন যে, জেলায় শিশু শ্রমিকদের সমস্যা ঘোরালো আকার ধারণ করেছে।

অসমের চা শ্রমিকরা শ্রমিকই রয়ে গেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অসমের চা-বাগান কর্মীরা নিজেদের পেশাগত প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সফল হয়নি। যদিও তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজন্মের ভারতীয়রা কর্মী হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিশাস প্রভৃতি দেশে যাওয়ার পর তা সম্ভব হয়েছে। ইংরেজ আমলেই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত থেকে চা-বাগানে কাজ করার জন্য শ্রমিকদের অসমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের পরবর্তী প্রজন্মের উত্তরাধিকারীরা জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি।" উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন ভারতের প্রধান বিচারপতি কে জি বালাকৃষ্ণণ।

গত ২৪ ডিসেম্বর অসমের ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় সভাগারে ইন্ডিয়ান ল' ইন্সস্টিটিউন্ট এবং অসম সরকার কর্তৃক যৌথভাবে অসমের চা-বাগান কর্মচারীদের বিষয়ে এক কর্মশালায় বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি এই মন্তব্য করেন।

শ্রীবালাকৃষ্ণণ দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ১৯৫২ সালে বাগিচা শ্রমিক আইন পাশ হওয়ার এতবছর পরেও চা-শ্রমিকদের শোষণ চলছে। তাদের স্বাধিকার রক্ষার ব্যাপারটা আইনে থাকলেও বাস্তবে নেই। তিনি আরও বলেন, ভিন্ন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকরা রাজ্যের জনজীবনের মূল ধারায় সম্মিলিত হতে না পারার ফলে অসুবিধাও হয়েছে। প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, চা-বাগান কর্মীদের কাজের নিয়মাবলী আরও স্বচ্ছ হওয়া উচিত এবং বিচার বিভাগের দায়িত্ব হল, বাগিচা-শ্রমিক আইন তার সঠিক অর্থে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা দেখা।

তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভারত সরকারকে আরও বেশি সংখ্যায় শ্রম আদালত এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনাল গঠন করার জন্য

বিচারপতি কে জি বালাকৃষ্ণণ

অনুরোধ জানিয়েছেন। আর চা-বাগান শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন ঠিকভাবে গড়ে উঠুক। কর্মশালাতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অজিত পাসায়াতও বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, অসমের চা-শিল্পকে চালু রাখার জন্য ম্যানেজমেন্ট এবং শ্রমিকদের মধ্যে পরস্পর সমন্বয় এবং বোঝাপড়াও জরুরি। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান-এর মতো শ্রমিকদের জন্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাও জরুরি।

কর্মশালায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অসমের গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রাধান বিচারপতি জে চেলামেশ্বর, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এম কে শর্মা, ভারতীয় চা পরিষদের সম্পাদক রবীন বড়ঠাকুর এবং অসম চা কর্মচারী সঙ্ঘের সম্পাদক গিরীশ বড়পাত্র গোহাঞি প্রমুখ।

কংগ্রেস-এ ইউ ডি এফ একীকরণ কিসের ইঙ্গিত ?

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মনমোহনের মন মজিয়ে মুসলমানদের মুসলিম লীগের নবতম সংস্করণ (অসমে) অসম ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টকে কংগ্রেসের সঙ্গে একাকার করতে অসমের একদল কংগ্রেসী মুসলমান মন্ত্রী দিল্লী সফর করে এলেন। শুধু অসম কেন, সারা ভারতেরই ওয়াকিবহালমহলের কাছে আজ আর অজ্ঞাত নেই কংগ্রেসের বাংলাদেশী মুসলিম প্রীতির কথা। বাংলাদেশীদের অসম থেকে বিতাড়িত করতে চায় না দুটি দলই। এই একটিমাত্র ইস্যুতেই তারা হলায় গলায় এক। সামনে লোকসভা নির্বাচন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আবার অসমবাসী। অসমের মন্ত্রী, এম এল এ-দের ভোটেই তিনি পিছনের দরজা দিয়ে রাজ্যসভায় ঢুকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসেছেন।

অসমের বন ও পরিবেশমন্ত্রী রকিবুল হুসেনের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়েছেন, তাঁরা কংগ্রেস এ ইউ ডি এফ নির্বাচনী সমঝোতার বিরোধী। কিন্তু তাঁরা চান এ ইউ ডি এফ-কে কংগ্রেসে মিলিয়ে নেওয়া হোক। তারা তাদের মনের কথা কংগ্রেসের অন্তরাত্মা তথা উপা'র চেয়ারপার্সন ম্যাডাম মোনিয়াজীর রাজনৈতিক সচিব আহমেদ প্যাটেলকেও নিবেদন করেছেন। তাদের বক্তব্য নির্বাচনী আঁতাত হলে দুটি দলেরই ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। অভিজ্ঞ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে আঁতাত বা মিলন যাই হোক না কেন মোদ্দা কথা হল, অসমে মুসলমান বিধায়ক-সাংসদদের সংখ্যাটা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। রকিবুলের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধিদলের অন্যান্যরা হলেন — ডঃ নজরুল ইসলাম, নূরজামিল সরকার (বিধায়ক), আবদুল খালেক, আব্দুল হাইনাগাড়ি, আব্দুল রসিদ মণ্ডল, আবু তাহের ব্যাপারী, কুতুবউদ্দিন আহমেদ মজুমদার, সংসদীয় সচিব দিলদার রেজ্জাক, মতিউর রহমান মণ্ডল এবং ইলিয়াস আলি।

সূত্র মতে এই প্রতিনিধিরা অসমে কংগ্রেস ও এ ইউ ডি এফ-র একীকরণ চেয়ে

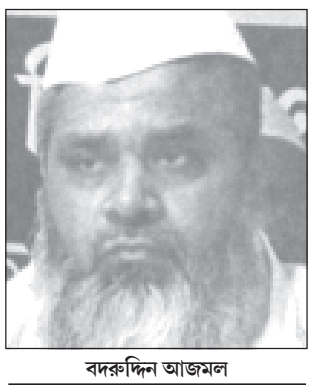

বদরুদ্দিন আজমল

প্রধানমন্ত্রীর কাছে ২৯ ডিসেম্বর দুপুর ১২-১৫-তে এক স্মারক লিপিও দিয়েছেন। অসম কংগ্রেসের এই সংখ্যালঘু নেতারা পরে জানিয়েছেন লোকসভা নির্বাচনের আগেই এই একীকরণ হোক। তারা তাদের মনোবাঞ্ছা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেত্রী মহসীনা কিদোয়াইকেও নিবেদন করতে ভোলেননি। মনমোহনও মন দিয়ে তাদের কথা শুনেছেন বলে জানিয়েছেন বিধায়ক আবদুল খালেক। খালেক সাহেব বললেন, তাদের এই অনুরোধ দলের হাইকম্যাণ্ড ভালোভাবে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

ওই নেতারা প্রধানমন্ত্রীকে আরও জানিয়েছেন যে, এ ইউ ডি এফ ও কংগ্রেস-এর নির্বাচনী আঁতত হলে কংগ্রেসের হিন্দু ভোটাররা বিমুখ করতে পারে। এদিকে আবার অসমের কংগ্রেস নেতাদের অপর একটি গোষ্ঠী কংগ্রেস — এ ইউ ডি এফ-এর সঙ্গে আসন সমঝোতা করতেই বেশি আগ্রহী। এই গোষ্ঠীতে আছেন — সাংসদ কিরিপ চালিহা, দ্বিজেন শর্মা, সিলভিয়াস

আঁতাতপন্থী কিরিপ চালিহা

কোন্ডাপন, চিত্তরঞ্জন পাটেয়ারি এবং বিষ্ণুপ্রসাদ প্রমুখ। গত বিধানসভা নির্বাচনে এ ইউ ডি এফ মুসলমান ভোটে ভাগ বসানোয় কংগ্রেস অসমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। তাদের বোড়ো পীপল্‌স্ প্রোগ্রেসিভ ফ্রন্টের সমর্থন নিয়ে সরকার গড়তে হয়েছে। কংগ্রেসের মুসলমান নেতাদের কথাবার্তায় পরিস্কার তারা কংগ্রেসের থেকে এ ইউ ডি এফ-এর প্রতি বেশি দায়বদ্ধ।

ব্যাপক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশেই উন্নয়ণ ব্যাহত অসমে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। পরিকল্পনা মাফিক ব্যাপক অর্থ বরাদ্দ সত্ত্বেও অসমের উন্নয়ণে প্রচুর পরিমাণে ঘাটতি থেকে গেছে। অসম সরকারও স্বীকার করে নিয়েছে যে, এর মূলে রয়েছে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশ থেকে অসমে বন্যার জলের মতো ঢালাও অবৈধ অভিবাসন যা থামার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। উন্নয়ণের মাত্রা বছরের পর বছর ধরে পিছিয়ে পড়ছে। এই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ-এর ফলে একই সঙ্গে জাতি-গোষ্ঠীগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও অনবরত ঘটে চলেছে। এছাড়া অসমে সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি এবং সব কাজেই ধীরগতি — অসমীয়া ভাষায় 'লাহে লাহে' যাকে বলে তা তো রয়েছেই।

১৯৪৭-এর দেশভাগ, ১৯৫০-এ বিধবংসী ভূমিকম্প, ১৯৬২-র ভারত-চীন যুদ্ধ— প্রদেশের এলাকাভিত্তিক জনবসতির অবস্থানকে আমূল পাল্টে দিয়েছে। সরকারি মতে ১৯৬৫ এবং ১৯৭১-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ১৯৭৯ থেকে অসমে বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে উলফা বা ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম-এর উদ্ভবও পরিকল্পিত উন্নয়ণ না হওয়ার অন্যতম কারণ বলে সরকার মনে করছে। স্বাধীনতার সময়ে অসমে মাথাপিছু গড় আয় সর্বভারতীয় গড় অনুপাতের তুলনায় সামান্য উপরেই ছিল। অথচ গত ২০০৬-০৭ এর যা হিসাব সেখানে দেখা যাচ্ছে অসমের মাথাপিছু গড় আয়ের অনুপাত সর্বভারতীয় অনুপাতের মাত্র ৬৬ শতাংশ, অর্থাৎ ৩৪ শতাংশ কম। এক সরকারি অফিসার জানান, ২০০৬-০৭ সালে রাজ্যের মোট ঘরোয়া আয়ের অর্থমূল্য যেখানে এক লক্ষ কোটি টাকা হওয়া উচিৎ ছিল সেখানে তা ৩৪,০০০ টাকা কম।

হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও উত্তরপ্রদেশে নেতাদের নিরাপত্তার বাড়াবাড়ি

মায়াবতীর জন্য সাড়ে তিনশ নিরাপত্তা রক্ষী

বিশেষ সংবাদদাতা।। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর চেহারাটা যেমন ভারিক্কি তেমনই বড়সড় বিপুলায়তন তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের সংখ্যা। এক হিসাব অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশের আম আদমির জন্য বরাদ্দ প্রতি এক হাজার জনসংখ্যাতে মাত্র একজন পুলিশকর্মী। তবে কী না মুখ্যমন্ত্রী বলে কথা, তাও আবার মহিলা এবং ক্রোড়পতি দলিত নেত্রী। সেজন্য মায়াবতীর একার নিরাপত্তার জন্যই মাত্র ৩৫০ জন পুলিশকর্মী নিযুক্ত রয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও তাবড় নেতারাও কম কীসে! এরকম বারো জনের জন্য গড়ে ৪৮ জন পুলিশ কর্মী দিবারাত্র পাহারা দিচ্ছে। এসকল বাদেও ৪৬৩ জন উত্তর -প্রদেশবাসীর জন্য বন্দুকধারী ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন রয়েছে। এই মহামহিমদের মধ্যে ৩৭৯ জনই রাজনৈতিক নেতা। এছাড়াও ভালো সংখ্যায় নিরাপত্তাকর্মী রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীদের ঘরে পাহারারত। অন্ততপক্ষে দশ হাজার-এর বেশি পুলিশ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িতে পাহারারত। বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা কুড়ি কোটির বেশি। সব মিলিয়ে পুলিশের সংখ্যাটা দু'লাখের মতো।

রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেকেই আবার দাগী অপরাধী।

সাধারণ মানুষ নিরাপত্তারক্ষীদের এই যথেচ্ছ ব্যবহারে বেশ ক্ষুব্ধ। এদিকে এলাহাবাদ উচ্চ আদালত ব্যক্তি-ব্যক্তির জন্য ঢালাও পুলিশকর্মী নিয়োগের বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য করেছে। এই মন্তব্যে বলা হয়েছে — ''জনগণের করের টাকার এভাবে দুরুপযোগ করা অন্যায়। এবিষয়ে এক্ষুণি প্রতিবন্ধ লাগানো উচিৎ। দাগী সাংসদ, বিধায়ক এবং অপরাধিক চরিত্রের লোকেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। রাষ্ট্রের খরচে তাদের জন্য নিরাপত্তা কেন দেওয়া হচ্ছে?'' এলাহাবাদ হাইকোর্টের সোজাসাপ্টা কথা 'প্রত্যেক সাধারণ নাগরিকই দেশের মূলধন। তাদের মৃত্যু মানে রাষ্ট্রের ক্ষতি। যদি এই সব অনাবশ্যক নিরাপত্তা কর্মী তুলে নেওয়া হয় তাহলে উত্তরপ্রদেশে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদ এবং অপরাধমূলক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।' যাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে এরকম কিছু উদাহরণ —

জৌনপুর জেলার বাহুবলী বিধায়ক ধনঞ্জয় সিংহ ঃ নির্দল প্রার্থী হিসেবে জিতে বহিনজীর বহুজন সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, আগামী লোকসভা নির্বাচনে তিনি জৌনপুর কেন্দ্র থেকে বসপা'র টিকেটে প্রার্থী হচ্ছেন। ধনঞ্জয়-এর বিরুদ্ধে আধ-ডজন খুনের অভিযোগ রয়েছে। জৌনপুর সাংসদ উমাকান্ত যাদব। মুলায়ম-এর সপা থেকে বিতাড়িত হয়ে বসপা-তে সামিল। কয়েকজন পুলিশকর্মী সহ এক ডজন হত্যার অভিযোগ রয়েছে তার

মায়াবতী

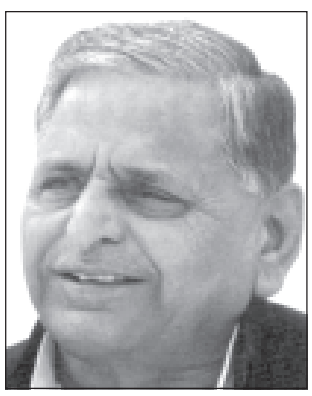
মুলায়ম

নামে। কী করুণ অবস্থা !. পুলিশদেরকে আবার পাহারা দিতে হচ্ছে তাকেই।

রিজওয়ান জাহির ঃ ইনিও সপা থেকে বসপাতে ভিড়েছেন। বলরামপুর-এর প্রাক্তন সাংসদ। উনারও আগামী সংসদীয় নির্বাচনে বসপা-র প্রার্থী হওয়ার কথা।

অরুণশঙ্কর শুক্ল ওরফে আন্না ঃ লক্ষ্ণৌ-এর অপরাধমূলক অতীতের সপা নেতা, বর্তমানে বসপাতে। বসপা তাকে ইতিমধ্যে উন্নাও আসনে দলের সংসদীয় প্রার্থী বলে ঘোষণা করে দিয়েছে।

দাগী সাংসদদের তালিকা যারা নিরাপত্তারক্ষী পেয়েছেন — ব্রজেশ পাঠক (রাজ্যসভা সদস্য, বসপা), অক্ষয় প্রতাপ সিং (প্রতাপগড় থেকে সপা সাংসদ), মিত্রসেন যাদব (এককালে সি পি আই -তে ছিলেন — বর্তমানে ফৈজাবাদ থেকে বসপা সাংসদ) ,ব্রীজভূষণ শরণ সিং (আগে সপাতে ছিলেন, এখন পদত্যাগ করে বসপা'তে ভিড়েছেন), ভালচন্দ্র যাদব (খলিলাবাদের সাংসদ), বালেশ্বর যাদব (সাংসদ— পডরৌনা), রমাকান্ত যাদব (প্রাক্তন সাংসদ), পারসনাথ যাদব (সপা-সাংসদ), আফজল আনসারি (সপা দলের সাংসদ), আতিক আহমদ (সপার সাংসদ এখন বসপাতে আছেন), এবং রাজনারায়ণ বুধৌলিয়া (সপা দলের সাংসদ) ।

সুরক্ষাপ্রাপ্ত দাগী বিধায়ক — দুর্গাপ্রসাদ যাদব এবং অঙ্গদ যাদব (আজমগড়), শিবপাল সিং যাদব (প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বিধায়ক -ইটাওয়া), পূজা পাল (বসপার বিধায়ক এবং নিহত দাগী বিধায়ক রাজু পালের স্ত্রী), অজয় পাল সিং যাদব (এটা), যমুনাপ্রসাদ নিষাদ (গোরক্ষপুর), অজয়প্রতাপ সিং ওরফে লল্লাভাইয়া (প্রাক্তন বিধায়ক), শৈলেন্দ্র যাদব (জৌনপুর), অনিস আহমেদ খাঁ (বিসলপুর, পিলভিট জেলা), রঘুরাজ প্রতাপ সিং ওরফে রাজা ভাইয়া (প্রতাপগড় - ইনি প্রাক্তন কংগ্রেসী মাঝে কিছুদিন বিজেপিতে ছিলেন), প্রমোদ তিওয়ারি (প্রতাপগড়), আনন্দ সেন (মিস্কিপুর, ফৈজাবাদ জেলা), ডি পি যাদব (গন্নোর-বদায়ুন), ভগবান শর্মা (বুলন্দশহর), মুখতার আনসারি (মহম্মদাবাদ-গাজিপুর), অমরমণি ত্রিপাঠী (মহারাজগঞ্জ), হাজি ইয়াকুব (মীরাট), অজম খাঁ (রামপুর), অখিলেশ কুমার সিং (রায়বেরিলি), চন্দ্রভান সিং (সুলতানপুর) অশোক চন্দেল (হামিরপুর), বাদশাহ সিং (মহোবা), আবদুল মান্নান (সনডিলা হরদোই), দাউদ আহমদ (শাহবাদ, হরদোই)।

প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর ৩৫০ জন পুলিশ বাদেও একজন ডি এস পি এবং একজন এ এস পি-ও নিযুক্ত আছেন। এছাড়া উত্তরপ্রদেশে জেড ক্যাটাগরির সুরক্ষা পান রাজ্যপাল টি ভি রাজেশ্বর, মুলায়ম সিং যাদব, বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং, কংগ্রেস নেতা প্রমোদ তিওয়ারি, বসপা-র সাধারণ সম্পাদক সতীশ চন্দ্র মিশ্র এবং ওই দলেরই রাজ্যসভা সদস্য নরেশ আগরওয়াল। এখানে উল্লেখ্য, জেড মানে ২৪ ঘন্টা তিন শিফ্‌টে ১৬ জন করে ৪৮ জন নিরাপত্তারক্ষী লাগে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে নেতাদের নিরাপত্তা দিতে জনগণের টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে কেন? যে নেতারা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে এত সন্ত্রস্ত তাদের পক্ষে জনসাধারণের নিরাপত্তা দেওয়া কী করে সম্ভব!

দক্ষিণে এল টি টি ই এবং মুসলিম ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে

সংবাদদাতা।। আই এস আই ও লস্কর-এ-তৈবার সঙ্গে যোগসাজস গড়ে তুলছে শ্রীলঙ্কার লিবারেশন টাইগারস্ অফ তামিল ইলম (এল টি টি ই)। এখন তাদের প্রধান লক্ষ্যস্থল কেরল ও তামিলনাড়ু। এল টি টি ই তার লক্ষ্যপূরণ করতে ইতিমধ্যেই মাঠে নেমে পড়েছে। আই এস আই এবং লস্কর-এ তৈবা-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা কেরল ও তামিলনাড়ুতে বড় ধরনের হামলার ছক কষছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের কাছে এর যথেষ্ট প্রমাণও হাতে এসেছে। কেরল ও তামিলনাড়ুর সমুদ্র উপকূলে মুসলিম প্রাধান্য বেশি থাকায় সমস্যা আরও বেড়েছে।

তামিলনাড়ুর সমুদ্র উপকূল দিয়ে প্রতিদিনই শ্রীলঙ্কায় বাণিজ্যিক দ্রব্য আদান-প্রদান চলছে। এল টি টি ই দুই দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থাকে ধাক্কা দিতে বেশি মরিয়া। ভারত ও শ্রীলঙ্কার বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তামিলনাড়ুর সমুদ্র উপকূলে প্রায়ই মৎস্যজীবীদের নিখোঁজ বা মৃত্যুর খবর বাড়ছে। যা সমস্যার ওপর-বিষ ফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এল টি টি ই তার এই অপারেশনে লস্কর এ তৈবা এবং আই এস আই-এর কাছ থেকে অস্ত্রের যোগান পাচ্ছে। রাশিয়ার গোয়েন্দা দপ্তর এই অপারেশনের পিছনে দাউদের হাত থাকতে পারে বলেও জানিয়েছে। এমনিতেই দুই রাজ্যে মাফিয়া ডনদের উপদ্রব গত কয়েক বছরে অনেকটাই বেড়েছে। এদিকে কেরলের বাম সরকার এত কিছুর পরেও কোনও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে কেরলের কুখ্যাত জঙ্গিরা গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকার মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক-এর কথা মাথায় রেখে নমনীয় ভূমিকা পালন করছে। কেরলের কুখ্যাত ডন নাজির সাইনুদ্দিন আবদুল জববর ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন-এর সঙ্গে যোগসাজস রয়েছে অথচ সরকারের সে বিষয়ে কোনও হেলদোল নেই। সিপিএম পরিচালিত কেরল সরকার মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়েই যে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বিরোধীদের অনেকেই তা স্বীকার করেছে।

সিপিএম, পিডিপি, এলডি এফ-এর মতো রাজনৈতিকদলগুলি ভোট বাক্সের দিকে তাকিয়ে পরোক্ষভাবে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে মদত যোগাচ্ছে। জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো তাদের কাছে থেকে রাজনৈতিক মদত পাচ্ছে। ভারতীয় জনতা পার্টি এই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করেছে। তাদের দাবি সরকার ভোটের জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিচ্ছে। বিজেপি এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারেরও সমালোচনা করেছে।

কেরল সি পি এম-এ চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দনের সঙ্গে দলের রাজ্য সম্পাদক পিনারাই বিজয়নের মন কষাকষি অনেক পুরনো। যদিও দুজনেই সি পি এম দলভুক্ত। দীর্ঘদিন যাবৎ একে অপরকে সব বিষয়ে টেক্কা দিয়ে আসছেন। ভোটের পরে বিজয়নকে মাৎ করে মুখ্যমন্ত্রীর গদী দখল করেছিলেন ভি এস অচ্যুতানন্দন। কেরালা থেকে সর্বশেষ যে খবর এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে — এবার অচ্যুতানন্দনকে বিজয়নের সামনে নতজানু হতে হচ্ছেই। সম্ভবতঅচ্যুতানন্দনকেতাঁর দল ও দলীয় কর্মীদেরকে 'বুর্জোয়া' প্রবৃত্তি থেকে বাঁচানোর প্রতিশ্রুতি থেকে পিছু হঠতে হচ্ছে। ৮৫ বছর বয়স্ক অচ্যুতানন্দন তাঁর সকল জারিজুরি দেখিয়েও কেল্লা ফতে করতে পারেননি। উপরন্তু নিজের গোষ্ঠীর সবাই অচ্যুতানন্দনের কাছ থেকে দূরে সরতে শুরু করেছে বলে দেখা যাচ্ছে, দূরত্ব বাড়ছে। দলে বিরোধী গোষ্ঠী, তাঁকে উদারবাদী তকমা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে হঠানোয় সফল হবে বলে মনে করছে। দলের মধ্যে রাজ্য সম্পাদক পিনারাই বিজয়নের গ্রুপবাজি, নীতিগত দ্বন্দ্ব সিপিএম-এর পলিটব্যুরোতে কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়ি শুরু করেছিল তার ফল অচ্যুতানন্দনের ক্ষেত্রে ভালো হয়নি। বিপক্ষে গেছে। পিনারাই রাজ্য সি পি এম-এ গোষ্ঠীবাজি করে অচ্যুতানন্দনের ঘনিষ্ঠদের হঠিয়ে সেখানে নিজ গোষ্ঠীর লোক বসাতে শুরু করেছে দীর্ঘদিন থেকেই। মুন্নার-এ দখলদার বিরোধী অভিযান এর সময়ই এই ঘটনা চোখে পড়েছে। সি পি এম-এর সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত এবং তদীয় পত্নী তথা পলিটব্যুরো সদস্যা বৃন্দা কারাত এবং পশ্চিমবঙ্গের তাবৎ কমরেডরা একসময় ঠিক করেছিলেন যে, অচ্যুতানন্দন-এর বিরোধী গোষ্ঠী যখনই কোনও প্রস্তাব রাখবে তাকে পুরোদমে বিরোধিতা করা হবে। এর কারণ হল, ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে অচ্যুতানন্দনকে মুখ্যমন্ত্রী ধরে নিয়ে তার গোষ্ঠীর লোকেদেরকে বেশি করে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। এই অবাধ সহযোগিতা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বজায় ছিল। কিন্তু এখন ছবিটা পুরো বদলে গিয়েছে। পিনারাই বিজয়ন গোষ্ঠী তো এখন সময় গুণতে শুরু করে দিয়েছে যে, এবার যে কোনও সময় অচ্যুতানন্দনের গদী চলে যেতে পারে।

অচ্যুতানন্দন

বিজয়ন

এদিকে পিনারাই বিজয়নের কাজ-কর্মে দলের অবস্থা বিগত দু'বছরে ক্রমশ খারাপ হয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত অচ্যুতানন্দন সর্বহারার একনায়কত্বের নীতি নিয়ে চলতেন। কিন্তু উনি ভালোই জানতেন যে, ওই আদর্শ মেনে কোথাও কেউ চলে না। কেরল সিপিএম-তো প্রচুর বিত্ত-সম্পত্তির মালিক। এখন দলে দলে লোকজন সি পি এম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কেরলের সব জেলাতেই দলত্যাগের হিড়িক পড়েছে।

আগামী লোকসভা নির্বাচন নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। একই সঙ্গে শুরু হয়েছে অচ্যুতানন্দনের বিকল্প নেতা খোঁজার পালা। পিনারাই বিজয়ন দীর্ঘদিন মুখ্যমন্ত্রীর গদীর দিকে লোলুপ নজরে তাকিয়ে আছেন। বিজয়নের নামে ৮২ কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারির কথা রটেছে। সি বি আই তদন্ত চলছে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে অচ্যুতানন্দনের বিদায় কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

বিষাক্ত কালনাগ আই এস আই-এর প্রথম পর্ব স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা-২০০৭-এ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বটি কয়েকটি কিস্তিতে প্রকাশ করা হচ্ছে। —সঃ স্বঃ

আমেরিকার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি-র জায়গায় এখন চীন দেশই পাকিস্তানের আই এস আই-এর প্রধান অর্থ সাহায্যের উৎস।....চীন দেশ পাকিস্তান আর্মি এবং আই এস আই-কে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য দিচ্ছে।

আই এস আই রোজ ভারতে ৫০ লাখ টাকার জাল নোট ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই নোটগুলি নিপুণভাবে ছাপা হয় পাকিস্তান সরকারের মিন্ট-এ।

বিষাক্ত কালনাগ আই এস আই

কিরণ শঙ্কর মৈত্র

এক

দু'হাজার সালের ২ নভেম্বর 'দ্য টাইম্‌স্ অফ ইন্ডিয়া' (দিল্লী সংস্করণ) পত্রিকার একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে — হিজব্-উল-মুজাহিদিন নামে যে সংস্থাটির সঙ্গে কেন্দ্র সরকার শান্তি বার্তায় নিযুক্ত ছিল, সেটি হল পাকিস্তানের একক বৃহত্তম উগ্রপন্থী সংস্থা, যে দলটি আই এস আই-এর কাছ থেকে সর্বাধিক আর্থিক সাহায্য পায়। আর্মি সূত্রে জানা যায় — এদের রয়েছে সুষ্ঠু সুগঠিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা।

২০০১ সালের অক্টোবরে নিষিদ্ধ হওয়া লস্কর-এ-তৈবা (বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক), মারকাজ-উদ্-দাওয়া-ওয়াল-ইর্‌শাদজ, একটি ইসলামী মৌলবাদী সংস্থা, ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত। পরে জানা যায় এটি 'জামাৎ-উল-দাওয়া'। ২০০৬ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিদেশি সন্ত্রাসবাদী সংস্থা রূপে অভিহিত করে।

এদের উদ্দেশ্য জম্মু-কাশ্মীর থেকে সিকিউরিটি ফোর্সকে হঠিয়ে দেওয়া এবং পাকিস্তানের চারদিকের সব মুসলিম প্রধান অঞ্চ লগুলিকে একত্রিত করা।

১৯৯৩ সাল থেকে ভারতের বিরুদ্ধে সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে ভালো ট্রেনিং-পাওয়া মিলিট্যান্ট রয়েছে লস্কর-এ-তৈবা-র, যারা ভারতীয় সেনা এবং অমুসলমান নাগরিকদের উপরে ফিদাইন আক্রমণ করেছে, যখনই সুযোগ পেয়েছে। ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের পার্লামেন্টের উপরে আক্রমণের জন্যেও এই সংস্থাটি দায়ী। দায়ী ২০০০ সালে লালকেল্লা, ২০০২ সালে কালুচক হত্যাকান্ড, ২০০৫ সালের অক্টোবরে নিউ দিল্লীতে প্রাক্-দেওয়ালীর রাত্রে বিস্ফোরণ এবং ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে ব্যাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র আক্রমণের জন্যে।

প্রায় সব লস্কর-এ-তৈবা সদস্যরা পাকিস্তানের মাদ্রাসা বা আফগানিস্তানের তালিবান বা অন্যত্র থেকে আগত। এরা অর্থ সাহায্য পায় পৃথিবীর প্রায় সব মুসলমান প্রধান দেশগুলি থেকে, ফিলিপাইনস্ থেকে, পশ্চি ম এশিয়া এবং চেচনিয়া ও বসনিয়ার মুসলিম মিলিট্যান্ট গ্রুপ থেকেও। এর উপরে প্রচুর অর্থ পায় পাকিস্তানের আই এস আই এর কাছে থেকে।

সেই সময়ে ভারতের গোপন সূত্রগুলি জানতে পারে যে মাসুদ আজহার পরিচালিত জৈশ-এ-মোহম্মদ নামে একটি পাকিস্তানী গোষ্ঠীকে আই এস আই অর্থ সাহায্য দিচ্ছে। যদিও হিজব-উল- মুজাহিদিন তখন একটু আর্থিক অসঙ্গতিতে ছিল — আর্মি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শুধু হিজব-উল-মুজাহিদিন পেয়েছে ১৮.৫ কোটি টাকা। পাকিস্তানের আই এস আই মাদক দ্রব্যের চোরাকারবারের মাধ্যমে বছরে ১০,৭৫০ কোটি টাকা আয় করে। আই এস আই উগ্রপন্থীদের মদত দিতে জম্মু-কাশ্মীরে এই অর্থের ৫ থেকে ১০ শতাংশ ব্যয় করে।

হিজব-উল-মুজাহিদিন কাশ্মীরে সর্বাধিক প্রভাবশালী পাকিস্তান-সমর্থক দল এবং এদের রয়েছে বেশ কয়েক সহস্র সমর্থক। নিজেদের ক্যাডারদের এই দলটি নানাভাবে পুষ্ট ও পুরস্কৃত করে। একটি সংবাদ সূত্র থেকে জানা যায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন কর্ণেলকে হত্যা করতে সমর্থ হলে এই গোষ্ঠিটি সেই ক্যাডারটিকে দেয় ৫০ হাজার টাকা 'পুরস্কার', একজন মেজরকে হত্যা করলে ২০ হাজার এবং একজন জওয়ানকে মারলে ১০ হাজার টাকা। এছাড়া ক্যাডারদের নিয়মিত মাসিক বেতন দেওয়া হয় পদ অনুযায়ী তিন থেকে বিশ হাজার টাকা (এই হিসাব ১৫ বছর আগের)।

ক'দিন পরে প্রকাশিত এক চমকপ্রদ খবরে জানা যায় যে পাকিস্তান আর্মি এবং আই এস আই-এর যুগ্ম প্রয়াসে খুনের অভিযোগে ধৃত জেলে বন্দী পাকিস্তানীদের মুক্তি দিয়ে কাশ্মীরে পাঠানো হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ডের জন্য। হলিউডের বিখ্যাত 'দ্য ডার্টি ডজন' ফিল্মের আদলে। ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স বিভাগ এবিষয়ে যে ধারণা পোষণ করে আসছিল তা বাস্তবে প্রমাণিত হয় যখন হুসেন নামে এক উগ্রপন্থী পাক-নাগরিক ধরা পড়ে। খুনের অপরাধে লাহোর জেলে চৌদ্দ বছর মেয়াদের কারাবাসে ছিল রাওয়ালপিন্ডির হুসেন। আই এস আই কাশ্মীরে উগ্রবাদী কর্মের বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেয়। (হিন্দী 'কার্তুজ' ফিল্মের কথা মনে পড়ে, যার প্রধান ভূমিকায় ছিলেন জ্যাকি শ্রফ ও সঞ্জয় দত্ত)। এ জন্যে তাকে আড়াই লাখ টাকাও দেওয়া হয়। লুঠতরাজ, বোমা বিস্ফোরণ গুলিবর্ষণ সব ধ্বংসাত্মক কর্মই ছিল তার তালিকায়। তার উপরে আবার বোনাস —ভারতীয় আর্মি এবং প্যারা-মিলিটারির কোনও অফিসারকে হত্যা করতে পারলে পাঁচ থেকে পঞ্চা শ হাজার, নিহত অফিসারের পদানুযায়ী। এইসব কাজ করতে গিয়ে মারা গেলে তার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে পাঁচ লাখ। এই সব কাজে সফল হয়ে বাড়ি ফিরে গেলে তাকে আর জেলে যেতে হবে না, সে তখন মুক্ত পাক-নাগরিক। জেলে বছরের পর বছর কাটাবার বদলে এ এক লোভনীয় প্রস্তাব সন্দেহ নেই।

হুসেন ছিল গুলি চালাতে ওস্তাদ। পাক্ অধিকৃত কোট্‌লিতে এক সপ্তাহ ট্রেনিং দেবার পরে পাক-আর্মি তাকে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে সাহায্য করে। সীমান্ত পার হবার পরেও দূর থেকে ওয়ারলেসে তাদের নানারকম নির্দেশ দেওয়া হয়।

কাশ্মীরের স্থানীয় অধিবাসীদের অন্তর্ঘাতী কাজে তেমন সাহায্য না পেলে আই এস আই বিদেশি উগ্রপন্থী সাহায্য নেয়। এদের অনেকেই আফগানিস্তানের তালিবানী।

জম্মু-কাশ্মীরে অন্তর্ঘাতী কাজের জন্যে আই এস আই সুন্দরী মেয়েদের ইংরেজিতে বিশেষ ট্রেনিং দিচ্ছে — এই খবর পায় ভারতের গোপন সূত্র। বিশেষ করে আর্মির লোকেদের বিভ্রান্ত করার কাজেই এইসব মেয়েদের 'হানি ট্র্যাপ' রূপে ব্যবহার করা হয়।

প্রসঙ্গত, সুন্দরী তরুণী যৌবনোচ্ছলা স্পাই ইরাফাতার কথা বিশেষভাবে

দাউদ ইব্রাহিম

উল্লেখযোগ্য। এই কাশ্মীরী যুবতীটির বয়স কুড়ি-বাইশ। দু'হাজার ছয় সালের আগস্ট মাসের শেষের দিকে তার খবর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিখ্যাত ইংরেজি রহস্য-রোমাঞ্চ কর ফিল্মের বন্ডের মতো সর্বাধুনিক ইলেক্‌ট্রিক গ্যাজেট ব্যবহার করে সে। তার হাতের দামি আংটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে শক্তিশালী অণু ক্যামেরা। তার সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। তবে পাঞ্জাব পুলিশের ওয়ারেন্ট লিস্টে খুবই উজ্জ্বলভাবে সে উল্লিখিত। ইরাফাতার বিশেষ লক্ষ্য আর্মি বেস্‌কে উড়িয়ে দেওয়া।

২০ আগস্ট (০৬) সে বিশেষভাবে খরদৃষ্টিতে আসে, যখন চারজন সন্দেহভাজন হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গিকে পাঞ্জাবের পাঠানকোটের কাছে একটি ছোট্ট শহর মাধোপু রে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু পুলিশের জাল থেকে বেরিয়ে গেছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় পাখিটি — সুন্দরী স্পাই ইরাফাতা। ধৃত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে যে সে শিখ-ভক্তের ছদ্মবেশে পালিয়ে যেতে পেরেছে। পুলিশের ধারণা — মাধোপুর আর্মি বেস উড়িয়ে দেবার প্ল্যান ছিল তার।

পাঠানকোটের এস পি-ভুপিন্দরজিৎ সিং বির্ক ওই বছরের ২৬ আগস্ট জানান, ধৃত হিজবুল জঙ্গি জাভেদ কাঠওয়ারি, জাহাঙ্গীর শফি ও তাহির জানিয়েছে যে, মাধোপুরের আর্মি বেসটিকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিতে ইরাফাতের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ২৫ আগস্ট এই বিস্ফোরণ ঘটাবার প্ল্যান ছিল। ইরাফাতাকে গ্রেপ্তারের পরেই আই এস আই-এর সঙ্গে তার সম্পর্কের গভীরতা জানা যাবে, অথবা যে শুধু এক পাকিস্তানী স্পাই।

পুলিশ জানায় যে, জম্মু-কাশ্মীরের হান্ডওয়ারার অধিবাসী বালাল ওরফে প্রিন্স নামে এক হিজবুল কর্মীর সঙ্গে ইরাফাতার শাদি হয়েছে। লাল সালোয়ার-কামিজ পরা ইরাফাতার একটি ছবি অবশ্য পুলিশ হস্তগত করতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশ জানতে পেরেছে যে ইরাফাতা ধৃত হিজবুলদের সঙ্গে দুদিন মাধোপুরে ছিল এবং এখানে একটি মেলায় গিয়ে সেখানকার পবিত্র মাজারও দর্শন করেছে। পাঞ্জাব পুলিশ কাশ্মীরে একটি পুলিশের দল পাঠিয়েছিল ইরাফাতা সম্বন্ধে আরও খবরা-খবর জানবার জন্যে। আরও খবর ছিল যে আই এস আই পাঞ্জাবের উগ্রবাদীদের সক্রিয় করে পশ্চি ম প্রান্তে আরেকটি ফ্রন্ট খুলবার প্রয়াস করেছে। আরও জানা যায় যে — উত্তর-পূর্ব ভারতের সন্ত্রাসবাদীদেরও নানাভাবে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য দিয়ে আই এস আই তাদের পুষ্ট করছে। নভেম্বরের শেষে (২০০০) তৎকালীন মিনিস্টার অফ স্টেট (হোম), আই ডি স্বামী লোকসভায় জানান যে, আই এস আই উগ্রপন্থীদের আর্থিক সাহায্যও দিচ্ছে এবং এর মধ্যে দিয়ে মাদক দ্রব্যের চোরাচালানকারী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে আঁতাতের পরিচয় পাওয়া যায়।

ওই বছরের ৬ ডিসেম্বর মুজফ্‌ফরনগরের (উত্তরপ্রদেশ) পাঁচকুন্ডায় পুলিশ ছ'জন লোককে গ্রেপ্তার করে যারা আই এস আই-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাদের কাছে পাওয়া যায় বহু টাকার নকল নোট। একই দিনে আই এস আই-এর সঙ্গে যুক্ত খালিদ মাহসুদ নামে (৪৫) এক পাকিস্তানী স্পাইকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছে ছিল ১০ কেজি আর ডি এক্স, ছ'টি টাইমার ও ছ'টি ইলেকট্রনিক ডিটোনেটর। পরের দিন প্রেস কনফারেন্সে পুলিশ কমিশনার অজয়রাজ শর্মা জানান — খালিদ নিজেকে লক্ষ্ণৌবাসী সঙ্গীত শিক্ষক বলে পরিচয় দিলেও আমরা মনে করি সে মূলত লাহোরের অধিবাসী। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মাদকদ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্র পাচারে জড়িত থাকার জন্যে। আই এস আই তাকে বাওয়াল পুরেই নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল।

পাঞ্জাবস্থিত আর্মির গোপন সূত্রেই খালিদের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। দক্ষিণ দিল্লীর বদরপুর থেকে সে তার কাজকর্ম চালাত। ফরিদাবাদের নীলম সিনেমার কাছ থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সমেত। আই এস আই তাকে নির্দেশ দিয়েছিল ভারতের সেনাবাহিনী, বিশেষ করে পাঞ্জাবের বিষয়ে — আর্মির মালবাহী ট্রেন,

(এরপর ৯ পাতায়)

বিষাক্ত কালনাগ আই এস আই

(৮ পাতার পর)

অস্ত্রাগার, পাওয়ার স্টেশন, ইন্দিরা গান্ধী ক্যানাল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজগুলির খবরাখবর আই এস আই-কে সরবরাহ করার জন্যে। পুলিশের বিশ্বাস — ইন্দো-নেপাল

আই এস আইয়ের কর্তা সুজা পাশা।

সীমান্ত থেকে ১৯৯৪ সালে সে ভারতে প্রবেশ করেছিল। প্রথমে সে ঘাঁটি গড়েছিল পাঞ্জাবের ভাটিন্ডায়, দু'বছর পরে যায় জলন্ধরে। ১৯৯৯ সালে দিল্লীতে এসে একটা ছোটখাট দোকান খোলে রোহিণীতে, গ্রেপ্তার হবার আগে ছিল বদরপুরে।

সে একটু পুরনো ধরনের গুপ্তচর। অদৃশ্য কালিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সাধারণ চিঠির আকারে লিখত। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠত সেই লেখাগুলি — পুলিশ কমিশনার জানান।

মেয়েদের 'হানি ট্র্যাপ' হিসেবে ব্যবহারের বিষয়ে আগে যে-কথা বলা হয়েছিল, সে-বিষয়ে ১৯ ডিসেম্বর লোকসভায় গৃহমন্ত্রকের রাজ্যমন্ত্রী বিদ্যাসাগর রাও একটি লিখিত বিবৃতিতে জানান — আই এস আই জম্মু-কাশ্মীরে

সম্প্রতি মুম্বাইয়ের ছত্রপতি স্টেশনে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের চিত্র।

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে মেয়েদের নিযুক্ত করছে। কেন্দ্র সরকার এ-বিষয়ে রাজ্য সরকার ও নিরাপত্তা বিভাগকে সতর্ক করে দিয়েছেন। দ্য টাইম্‌স্ অফ ইন্ডিয়ার (দিল্লী সংস্করণ) ২৫ ডিসেম্বরের সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় ভারতের আই এস আই-র কর্মকান্ডের বিষয়ে কোনও রিপোর্ট ভারত সরকার এর মধ্যেই প্রকাশ করতে পারছেন না, তাতে গোপনীয়ভাবে সংবাদ সংগ্রহে বাধা ঘটবে।

কলকাতায় বসে একজন আই এস আই এজেন্ট চন্ডীপুরের 'ইন্টেরিম্ টেস্ট রেঞ্জ' সম্বন্ধে 'টপ সিক্রেট' সংবাদ সংগ্রহের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার আরও আটজনের সঙ্গে যোগসাজস করছিল। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি তদন্ত করে জানতে পারে — এদের পান্ডা হচ্ছে একজন বাংলাদেশী, আমজাদ আলি ওরফে রণজিৎ সিংহ ওরফে রমজান গাজি ওরফে তপন দে। ১৯৯৭ সালে এদেশে এসে সে দমদমের সুভাষনগরে ঘর ভাড়া নেয়। প্রায় ওই সময়েই ভারত সরকার অস্ত্র কিনবার জন্যে বিশ্বব্যাপী টেন্ডার ডেকেছিল। ফ্রান্স সরকার ত্বরিতে সাড়া দিয়ে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চেয়ে চিঠি দেন — ভারত সরকার কোন ধরনের অস্ত্র কিনতে চান। যখন যোগাযোগ চলছিল তখন পাক-সরকার সক্রিয় হয়ে ওঠে — ভারত সরকার কোন ধরনের অস্ত্র কিনছে জানবার জন্য। এইসব খবর সংগ্রহের জন্যেই আমজাদ আলিকে আই এস আই নিযুক্ত করেছিল। আমজাদ আলি এদেশে তার জাল ছড়িয়েছিল। তাছাড়া মাঝে মাঝেই সে পাকিস্তানে যেত বিশেষ ধরনের ট্রেনিং নেবার জন্যে। একথা এখন স্পষ্টতই প্রকাশ পেয়ে গেছে যে আই এস আই, লস্কর-এ-তৈবা উগ্রপন্থীদের ভারতে ব্যাপক হিংসাত্মক কাজে নিযুক্ত করছে। ৩ জানুয়ারি (২০০১) দিল্লী পুলিশ এদের চারজন উগ্রপন্থীকে গ্রেপ্তার করে যারা লাল কেল্লায় সেনা ব্যারাকে হামলা করায় যুক্ত ছিল, ওই হামলায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল।

পুলিশ আগেই এই চক্রের আশফাককে গ্রেপ্তার এবং এক এনকাউন্টারে দক্ষিণ দিল্লীর বাট্‌লা হাউসে আবু সালেমকে নিহত করেছিল। ১ জানুয়ারি বাট্‌লা হাউসের কাছে আশাফাকের আবাসস্থল থেকে তিনটি গ্রেনেড উদ্ধার করেছিল পুলিশ। আশফাকের বর্ণনানুযায়ী তার চার স্যাঙ্গাতের পোর্ট্রেট বানিয়ে পুলিশ প্রকাশ করেছিল। আশফাক জানিয়েছিল — লাল কেল্লায় হামলা করার পরে এরা দু'জন করে দু'দলে জম্মু-কাশ্মীরে চলে গিয়েছিল। এই চারজন হল — আবু হায়দার, বিলাল আহমেদ, আবু সুখাব ও আবু সাদ। পাকিস্তান থেকে বিশেষ ট্রেনিং দিয়ে, সন্ত্রাসী কাজের জন্যে গতবছর ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এদের দিল্লীতে পাঠানো হয়েছিল। ওই একই সময়ে মুম্বাই পুলিশও লস্করদের আরেকটি দলকে গ্রেপ্তার করে তারা শিবসেনা দলের এবং অন্যান্য নেতাদের খতম করার জন্যে এসেছিল।

উল্লেখ্য এই আততায়ীদের একজন আবু হাম্‌জাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যে মুম্বাই-এ একটি সাইবার কাফে খুলেছিল। কাফেকে সামনে রেখে কুকর্ম চালাত সে। দিল্লীতেও অনেক উগ্রপন্থীর এমনই সাইবার কাফে রয়েছে।

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে উত্তরবঙ্গে আই এস আই কর্মকান্ডে উদ্বিগ্ন হয়ে কেন্দ্র সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ইন্দো-নেপাল সীমান্তের ২১টি পুলিশ চেক

টাইগার মেনন

পোস্টকে আরও সক্রিয় হবার জন্যে সতর্ক করে দেয়। উত্তরবঙ্গে আরও একটি উগ্রপন্থী সংস্থা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল যে জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। এই সংস্থার নাম কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কে এল ও)। এদের কথা যথাস্থানে বিস্তারিত বলা যাবে।

।। দুই ।।

আই এস আই যে অপ্রতিহত, অসীম ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ১৯৯০ সালে, শুধু সেই একবারই, বেনজির ভুট্টো চেষ্টা করেছিলেন এর ভূমিকা, দায়িত্ব, বাধ্যবাধকতা বিষয়ে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ করতে। ভূতপূর্ব এয়ার মার্শাল জুলফিকার আলি খান-এর নেতৃত্বে একটি কমিশনের মাধ্যম অনুসন্ধান করে। কিন্তু এর কয়েক মাসের মধ্যে বেনজির নিজেই ক্ষমতাচ্যুত হন। জুলফিকার আলি খানের রিপোর্টে দেখা যায় — আই এস আই যুক্তি ও সীমা-বহির্ভূত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত। তিনি মন্তব্য করেন এটি একটি 'আউট ল' অর্থাৎ বিধিবহির্ভূত বেপরোয়া গোষ্ঠী। কারো কাছেই কৃতকর্মের জন্যে কোনও কৈফিয়ৎ দেবার দায় এদের নেই। তিনি সুপারিশ করেছিলেন — আই এস আই-এর কর্মসূচীকে পুনঃপরীক্ষা ও সংশোধন করে নির্বাচিত পার্লামেন্ট দ্বারা অনুমোদিত হওয়া দরকার।

(সৈয়দ আলি, দায়ান হাসান এবং মুবাশির জৈদি 'দ্য হেরল্ড অ্যানুয়াল, জানুয়ারি ২০০১'-তে এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার নিবন্ধ লিখেছেন।)

ইউনিভার্সিটি অফ্ ওয়াটার্লু, ওন্টারিও (কানাডা)-র প্রফেসার অশোক কাপুর দিল্লীতে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে ভারতের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের আলোচনা সভায় বলেছেন — আমেরিকার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি-র জায়গায় এখন চীন দেশই পাকিস্তানের আই এস আই-এর প্রধান অর্থ সাহায্যের উৎস। তিনি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন — চীন দেশ পাকিস্তান আর্মি এবং আই এস আই-কে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য দিচ্ছে, কারণ এরাই ভারতের শক্তি সীমিত রাখবার জন্যে লো-রিস্ক চীপ স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী চীন দেশ পাকিস্তানকে উৎসাহ দিচ্ছে ভারতের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু সেই সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরেও রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে।

ফেব্রুয়ারি মাসের (২০০১) প্রথমদিকে দাউদ ইব্রাহিম করাচি থেকে নেপালে এসে রাজধানী কাঠমান্ডুতে তিনদিন কাটায়। গোপনসূত্রে জানতে পেরে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলি তৎপর হয়ে ওঠে। নেপাল বহুদিন থেকেই আই এস আই-এর আশ্রয়স্থল। দাউদের নেপালে আসার কারণ, গোপনসূত্র অনুযায়ী, আই এস আই-কে কিছু নতুন কলাকৌশলে সমৃদ্ধ করা, যাতে তাদের সন্ত্রাসবাদী সাহায্যের পরিবর্তে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবাংলায় মাফিয়া গোষ্ঠীগুলিকে অর্থ সাহায্য দিয়ে ভারতবর্ষে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায়। গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে দেয় যে, ভারত-নেপাল সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে আই এস আই-এর উগ্রপন্থীরা ভারতের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, হত্যা-হিংসাত্মক কাজকর্ম করার চেষ্টা করবে। এদের সঙ্গে থাকবে সবরকম মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রচুর অর্থ। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো কাঠমান্ডুর কর্মালি, রাদা কাঠি পথ ও অন্নপূর্ণা হোটেলের রুম নাম্বার ও তারিখও উল্লেখ করে, যেখানে দাউদ পাঁচতারা হোটেলের সবরকম বিলাস-আরামে সপ্তাহকাল ধরে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে। রিপোর্টে এক শাহ্ ভ্রাতাদের কথাও উল্লেখ করা হয়, যারা কাঠমান্ডুতে দাউদের সঙ্গে দেখা করেছিল। এই শাহ্ ভাইদের কাঠমান্ডুতে রয়েছে একটি সামরিক পত্রিকা, কেবল টিভি নেট্‌ওয়ার্ক। এই টিভিতেই ফিল্মের হৃত্বিক রোশনের নাম দিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিল যে সমস্ত নেপালে তীব্র ভারত বিদ্বেষী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অবিশ্বাস্য হলেও এই শাহ্ ভাইদের ভারতেও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে যারা নেপালে আই এস আই-কে নানাভাবে সাহায্য করে। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো দাউদের থাইল্যান্ডে একটি টেলি-কনফারেন্স বার্তা রেকর্ড করে জানতে পারে যে নেপাল সীমান্ত দিয়ে উত্তরপ্রদেশের মধ্য দিয়ে অনেক শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র আনা হবে। এই সূত্রে জানা যায় যে, দিল্লীতে সন্ত্রাসবাদী হানা কঠিন হওয়ায় আই এস আই এখন উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবাংলায় আক্রমণ চালাবে। জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে বোমা বর্ষণ সেই প্ল্যানেরই অন্তর্গত। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে রয়েছে আই এস আই-

বর্তমান পাক সেনাপ্রধান জেনারেল কিয়ানী

এর পুষ্ট সুগঠিত সশস্ত্র অপরাধী গোষ্ঠী। তাদের চাই আগ্নেয়াস্ত্র ও অর্থ।

এই রিপোর্টে আরও জানা যায় যে মাফিয়া ডন বাবলু শ্রীবাস্তবের পূর্বতন সঙ্গী মাঙ্গে এখন দাউদের আশ্রয়পুষ্ট এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও হত্যার অপরাধে আদালতের রায়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত। নেপালে দাউদের বিশ্বস্ত মির্জা দিলশাদ বেগ নিহত হয় ছোটা রাজন গোষ্ঠীর হাতে। জানা যায় — দাউদের নেপালে আসার অন্যতম কারণ বেগের জায়গায় অন্য কোনও বিশ্বাসী ব্যক্তিকে নিয়োগ করার জন্য।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটির অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল হিমাংশু কুমার ১২ মার্চ (০১) অপরাহ্নে সাংবাদিকদের জানান যে উত্তরপ্রদেশ এখন আই এস আই-এর কার্যবিধির একটি আড্ডা। আই এস আই-এর এজেন্টদের নিরাপদ আবাসভূমি এখন গাজিয়াবাদ জেলার হাপুর, পিলুখোয়া ও মুসৌরি। এছাড়া শহীদনগরেও তারা ছড়িয়ে আছে।

১৩ মার্চ (২০০১) লোকসভায় তৎকালীন গৃহমন্ত্রী এল কে আদবানি সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্নের জবাবে বলেন — মায়ানমার (বার্মা), বাংলাদেশ ও নেপালের সঙ্গে ভারত আলোচনা করেছে — কীভাবে ভারতের সীমান্তে আই এস আই সহ অন্যান্য উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বন্ধ করা যায়। এছাড়া আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, ইজরায়েল ও জার্মানির সঙ্গে সংযুক্ত কার্যনির্বাহী গোষ্ঠী স্থাপন করে ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সহায়তা কার্যকর করতে সক্ষম হয়েছে।

আই এস আই আরেকটি ব্যাপারে বিশেষ

(এরপর ১৩ পাতায়)

হিন্দু সন্ত্রাসবাদের তত্ত্ব

ইদানীং 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদী' কথাটা বিভিন্ন সেকুলারবাদী (সংখ্যালঘু তোষণকারী) রাজনৈতিক নেতার মুখে শোনা যাচ্ছে এবং তাঁদের দোসর অধিকাংশ বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও সংবাদপত্র ফলাও করে তা প্রচারও করছে। আর এই 'সব শেয়ালের এক রা' প্রথম শোনা যাচ্ছিল বা প্রচার পাচ্ছিল মালেগাঁও বিস্ফোরণের প্রায় দু'বছর পর কয়েকটি রাজ্যে অতি সম্প্রতি সমাপ্ত হওয়া বিধানসভা নির্বাচনের সময়। অবশ্য কথাটার উৎপত্তিস্থল পাকিস্তান। পাকিস্তানের মদত ও আশ্রয় প্রাপ্ত বিভিন্ন ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনের নেতাদের মুখে কথাটা বহুল প্রচারিত। কথায় কথায় তারা এ কথাটি উচ্চারণ করে থাকে এবং ভারতে সংঘটিত যে কোনও প্রকার সন্ত্রাস, হত্যালীলা, অন্তর্ঘাত বা বিস্ফোরণের সঙ্গে 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদী'রা যুক্ত এবং তারাই এসব দেশবিরোধী ক্রিয়াকলাপ ঘটিয়ে চলছে বলে তাদের বক্তব্য। আর তাদেরই কথা আমদানি করেছেন এদেশের সেকুলারবাদী তথা হিন্দু বিদ্বেষী রাজনীতিকরা এবং প্রচারমাধ্যমগুলি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এদেশেরই শুধু নয়, বিশ্বের মানুষ যখন সন্ত্রাসবাদী বলতে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদেরই বোঝে তখন সেকুলারবাদী নেতা ও প্রচার মাধ্যম 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদী' কথাটি চাউর করে জনগণের কাছে এই বার্তাই পাঠাতে চাইছেন, সন্ত্রাসবাদী শুধু মুসলিমরাই নয় — হিন্দুরাও। উদ্দেশ্য, সন্ত্রাসবাদী প্রশ্নে দেশের হিন্দু ও অহিন্দু বিভাজন বা মেরুকরণ না ঘটানো এবং সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে হিন্দুদেরও জড়িয়ে দিয়ে বিশ্বের কাছে হিন্দুদেরও সন্ত্রাসবাদী প্রতিপন্ন করা। এদেশের হিন্দুরাও আর যাতে প্রসঙ্গক্রমে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের দিকে আঙুল তুলতে না পারে। আসলে সবই হিন্দুদের অপদস্থ করার কৌশল। আবার যাঁদের দিকে আঙুল উঠেছে তাঁরা সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। কেউ সামরিক বাহিনীর লোক, কেউ বা হিন্দু সাধু সন্ত বা ধর্মগুরু। পুলিশ প্রমাণ করতে চাইছে, হিন্দুরাও সন্ত্রাসবাদী, সাধবী প্রজ্ঞা-স্বামী দয়ানন্দ প্রমুখরা ভন্ড-প্রতারক এবং লেঃ কর্ণেল পুরোহিত সন্ত্রাসবাদীদের স্রষ্টা। অথচ মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা যে মালেগাঁও বিস্ফোরণের চেয়েও অসংখ্য বড় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সে ব্যাপারে কিন্তু সরকার, গোয়েন্দা বাহিনী ও পুলিশ প্রশাসন ততটা তৎপর নয়, জোরালো তদন্তেও ইচ্ছুক নয়। কারণ একটাই — মুসলিম ভোট। হিন্দুদের গায়ে 'সন্ত্রাসবাদী' তকমা সেঁটে দিতে পারলে মুসলিমরা উল্লসিতই হবে এবং তাদের ভোটে কংগ্রেসের বাক্স ভরে উঠবেই। আসলে ক্ষমতা বড় বালাই। আর তার জন্য সেকুলারবাদীরা দেশটাকে মুসলিমদের পাদপদ্মে সমর্পণ করতেও পিছপা নন। তাঁদের কাছে দেশের চেয়ে ক্ষমতা বড়।

তাছাড়া সেকুলারবাদীরা দলবদ্ধ হয়ে হিন্দুদের সন্ত্রাসবাদী সাজিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আর এস এস, বজরং দল, বিজেপি প্রভৃতি হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার অভিযোগ এনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু ওই 'মূর্খ'রা জানে না, হিন্দুরা ধর্ম, সংস্কৃতি ও পরম্পরাগতভাবে সন্ত্রাসবাদী হতে পারে না। কিন্তু ইসলামে রয়েছে সন্ত্রাসবাদী সৃষ্টির যথেষ্ট উপাদান। কোরান বর্ণিত 'জেহাদ', 'কাফের', 'গাজি', 'শহীদ', 'দারুল হারব' ইত্যাদি শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা আগে জানুন।

ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

সহ্যের সীমা

২৬।১১।০৮ তারিখের পাকিস্তানী আতঙ্কী হামলা আজ পর্যন্ত ভারতের সবচেয়ে বড় হামলা। তার পূর্বে সারা রমজান মাস জুড়ে প্রায় প্রত্যহ ছোট-বড় হামলা হয়েছে। বিগত দুই বৎসরে প্রায় ২০০০ লোক মারা গেছেন। অনেকে সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে রয়েছেন। এখন শুনছি গত ফেব্রুয়ারি মাসেই ২৬।১১।০৮ মুম্বাই হামলার খবর উত্তরপ্রদেশের এস টি এফ কর্তৃক ধৃত রামপুরের ব্লাস্টার ফাহিম আনসারি তার স্বীকারোক্তিতেই দিয়েছিল। শুধু দিন জানা ছিল না। এখন ফাহিমকে মুম্বাই পুলিশের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সেই রিপোর্ট এতদিন ফাইল চাপা ছিল স্বরাষ্ট্র দপ্তরে। তাহলে মুম্বাই এ টি এস বা পুলিশ কর্তৃপক্ষ কী জানতেন না বা মন্ত্রী মহোদয়রা কি ইচ্ছাকৃতভাবে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন? ২/৩ জন শীর্ষ এ টি এস কর্তা বিনা এনকাউন্টারে শহীদ হলেন। এখন নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন অনেক সিকিউরিটি ল্যাপস্ হয়েছে। তাহলে ভারতের ও মহারাষ্ট্রের সুরক্ষা দপ্তর কোন জমিদারের পাহারাদার — (সোনিয়া গান্ধী) কংগ্রেসের না ভারতের নিরীহ নির্দোষ সাধারণ মানুষের?

আমার ধারণা বর্তমানে এই দুর্বল ভারত সরকার কোনও ভাবেই পাকিস্তানের শয়তানির যোগ্য জবাব দিতে পারবে না এবং স্বদিচ্ছাও নেই। তারা শুধু ভোট ও ক্ষমতা লাভের জন্য ব্যস্ত। জাত-পাত বিভাজন — এস-সি, এস টি, ওবিসি-দলিত;লালু যাদব-মুসলিম রসায়ণ, মায়াবতীর দলিত ব্রাহ্মণ রসায়ন, মুলায়মের যাদব ও মুসলিম মিলন — এছাড়াও গোপনে আরও কত কি হচ্ছে তা স্বয়ং ঈশ্বরও জানেন না।

চিঠিপত্র

এবার দেখি দুটি বড় দল যখন বলছে তখন সরকার কী ব্যবস্থা নেয়। আমেরিকার উপর অনেকেরই বিশ্বাস নেই। আর পাকিস্তান তালিবান ও আল কায়দার মুখোশ মাত্র এবং বাংলাদেশও তাই। সহ্যের সীমা অতিক্রম করার বোধহয় সময় হয়েছে।

বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসাত, উঃ ২৪ পরগণা।

না-পাকপাকিস্তান

পাকিস্তান নামটির অর্থ পাক অর্থাৎ পবিত্র স্থান। অথচ আমরা দীর্ঘকাল ধরেই দেখে আসছি, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় এর চিহ্ন মাত্র নেই। স্বদেশে- বিদেশে মারামারি-কাটাকাটি অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করে দেশের জনমতকে বিভ্রান্ত করাই এই রাষ্ট্রের প্রধান রাজনৈতিক মতাদর্শ। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এমন পরিস্থিতি নিয়ে স্বভাবতই ভারতবাসীর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, যেখানে একই সময়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সমাজ জীবন গড়ে উঠেছে, সেখানে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এমন পরিণতি কেন? এ বিষয় নিয়ে একটাই কথা বলা যায়, জন্ম সূত্রে যেমন এক একটি মানুষের সমাজ সংসার গতানুগতিক নিয়মে গড়ে ওঠে, রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোও তেমনি গড়ে ওঠে তার জন্ম লগ্নের রাজনৈতিক মতাদর্শের উপরে নির্ভর করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, পাকিস্তানের জন্মদাতা ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী ভারত বিদ্বেষী জনগোষ্ঠী। যাদের মতাদর্শ ছিল অমুসলিম সমাজ জীবনকে ধ্বংস করে মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এমন মতাদর্শের মানুষ কখনো নিজের বা অপরের মঙ্গল চিন্তায় আত্মনিয়োগ করতে পারে না। তাদের হিংস্র মানসিকতা সব সময়ই সর্বত্র আতঙ্ক ছড়ায় পাকিস্তানের অভ্যন্তরে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যেসব মুসলিম সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলছে তার কর্মকর্তাগণের মধ্যে অধিকাংশই পাকিস্তানের জন্মদাতাদের বংশধর। এই বংশধরগণই এখন তৈরি করেছে একটি অপবিত্র পাকিস্তান।

শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

অহিংসা ও কংগ্রেস

অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

পরের সম্পদে দানসত্র খুলে কিংবা মোচ্ছব করে সমাজের মাথায় ওঠার প্রবৃত্তি কিছু ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়। বিশ্বে বিরল উদাহরণ— ভারতের শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দলটিও ওই সম্প্রদায়ের। তথাকথিত অহিংসা এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার মন্ত্র জপে ভারতের মূল অধিবাসী সংখ্যাগুরু হিন্দু জাতিকে সম্মোহিত করে, দেশের অখণ্ডতা, জাতি সত্তা এবং ধন-প্রাণ ও মানকে "বাজি" রেখে একসঙ্গে শান্তির নোবেল প্রাইজ ও মহামানবের শিরোপার স্বপ্ন দেখেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, যিনি অহিংসক, কংগ্রেসের আদর্শ ও গুরু। আমৃত্যু তিনি শান্তি ও অহিংসার ভজনা করে গেছেন। হিন্দুকে ঘুম পাড়ানো সহজ হয়েছিল কারণ, হাজার বছরের পরাধীনতায় অতীতের ক্ষাত্র তেজ ও বিচক্ষণতা হারিয়ে হিন্দু প্রায় গড্ডালিকায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। জৈনধর্মের সন্ন্যাস মার্গী অহিংসার বটিকা গিলিয়ে তিনি হিন্দুকে বলির পাঁঠাতে পরিণত করেন।

এহেন গুরুর বশংবদ অনুগামী কংগ্রেসীরা গভীর নিষ্ঠায় তাঁর প্রদর্শিত পথে বাস্তবে অহিংসা পালনের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে চলেছে তার দু'একটি উদাহরণ—

১৯৪৮ খৃঃ নাথুরাম গড়্সে যখন গান্ধীকে গুলি করে হত্যা করেন, তখন তাঁর দেহরক্ষী তথা অনুগামীদের লাঠির আঘাতে নাথুরামের মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। শুধু তাই নয়, গড়্সে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে অহিংসক কংগ্রেসীরা শতাধিক ব্রাহ্মণকে হত্যা করে ও তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। অথচ কেবল হিন্দুকে (কংগ্রেস) গুরুর উপদেশ ছিল মুসলিমদের পাহাড় প্রমাণ অত্যাচারেও সামান্যতম প্রত্যাঘাত না করা, প্রতিবাদে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত না করা। ১৯৪৬ খৃঃ কলকাতায় সুরাবর্দির নির্দেশে "ডাইরেক্ট অ্যাক্শনে" মুসলিমদের দ্বারা নির্মম হিন্দু নিধনের প্রতিক্রিয়ায় বিহারের হিন্দুরা যখন

জনমত

মুসলিমদের আক্রমণ করে, তখন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ক্রুদ্ধ ঘোষণা ছিল যে দাঙ্গাকারী হিন্দুদেরকে মেশিনগানের গুলিতে ও বোম্বিং করে দমন করা হবে। বোম্বিং না হলেও গুলিতে প্রায় আড়াইশ হিন্দু নিহত হয়।

১৯৪৭-এ শাসনভার গ্রহণের পর ভারতের তিন সেনা প্রধানকে নেহরু বলেছিলেন ভারতের সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন গৌণ, কারণ প্রতিবেশী দেশগুলো সব বন্ধু। কেবল দেশের অভ্যন্তরে দাঙ্গাবাজ হিন্দুদেরকে পেটাতে পুলিশবাহিনী দরকার।

১৯৮৪ খৃঃ ইন্দিরা গান্ধী নিহত হন তাঁর শিখ দেহরক্ষীদের দ্বারা। প্রবল বিক্রমে অহিংসক কংগ্রেসীরা প্রায় চার হাজার মতো নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে শিখকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়। মন্ত্রে বিধৃত শিখরাও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে হিন্দুই।

বৃটিশ শাসনে কেরালার (মোপলা) দাঙ্গার হেতু গান্ধীজীই। কারণ তিনি ভারতীয় মুসলিমদেরকে বৃটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে সামিল করতে তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের খালিফাতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। খলিফাতন্ত্র নির্মূল হওয়ায় ক্ষিপ্ত মোপলা মুসলিমরা হিন্দুদেরকে আক্রমণ করে দেড় হাজার মতো হিন্দুকে হত্যা করে ও কুড়ি হাজারকে ধর্মান্তরিত করে। বিলম্ব হলেও দাঙ্গাক্লিষ্ট হিন্দুদের জন্য সরকারি সহায়তায় গান্ধী উষ্মা প্রকাশ করেন। তিনি হিন্দুদেরকে যথারীতি সহনশীলতার ললিত বাণী দান করেন।

মুসলিম তোষণ ও হিন্দু-বৈরীতার মন্ত্রে দীক্ষিত অহিংসক কংগ্রেসীরা আজ বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে একজোটে ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রথমাবধি কংগ্রেসের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে বা স্বার্থদুষ্ট উদাসীনতায় মুসমিল জঙ্গিরা, এমনকী বর্তমানে অকিঞ্চিৎকর সংখ্যালঘু ধর্মান্তরিত খৃস্টানরাও হিন্দু সন্ন্যাসীদেরকে খুন করে চলেছে। এইভাবে কংগ্রেসীরা তাদের অহিংসার যূপকাষ্ঠে হিন্দুদেরকে বলি দিয়ে চলেছে গভীর আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে।

সমাবেশ সমাচার

অর্শ চিকিৎসা শিবির

সমাজ সেবাভারতী উত্তরবঙ্গ শাখার উদ্যোগে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘীতে গত ১৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল নিঃশুল্ক অর্শ চিকিৎসা শিবির। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ষাটজন রোগী এই শিবিরে চিকিৎসা করান।

মঙ্গলনিধি

হুগলি জেলার কাপাসডাঙ্গা শাখার স্বয়ংসেবক দীপাঞ্জন গুহ'র বিবাহ উপলক্ষ্যে তাঁর পিতা দীপক কুমার গুহ সম্প্রতি মঙ্গলনিধি প্রদান করেন।

বাঁকুড়ায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ধর্ম-সংস্কৃতি সম্মেলন

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বাঁকুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে গত ১৪ ডিসেম্বর এম টি পি সি কালোনীর কালীমন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল বিরাট ধর্ম-সংস্কৃতি সম্মেলন। এই সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন সঙ্ঘের সহ - সম্পাদক তথা বাঁকুড়া শাখার অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী অরুণানন্দজী মহারাজ। প্রধান অতিথি ছিলেন এন টি পি সি-র চিফ ইঞ্জিনীয়ার তথা প্রজেক্ট হেড অমল কুমার সরকার। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী সুপ্রভানন্দজী প্রমুখ। সম্মেলনে বৈদিক শান্তি-যজ্ঞ, আত্মরক্ষামূলক লাঠি খেলা, বস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় এক হাজার ভক্ত শিষ্য প্রসাদ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা ও ধন্যবাদ জানান স্বামী জ্যোতিষানন্দজী।

প্রাতঃভ্রমণকারীদের মিলন মেলা

অন্যান্য বছরের মতো এবারও ২৫ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কল্যাণগড় সংস্কৃতি সঙ্ঘ শিক্ষা নিকেতন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল প্রাতঃভ্রমণকারীদের মিলন মেলা। ষোল বছর ধরে চলা এই মেলা রাজনৈতিক ভেদাভেদের উর্ধে উঠে সমাজের বিভিন্ন ধরনের তথা বিভিন্ন স্তরের মানুষ যোগদান করেন। উল্লেখ্য এই মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা' পত্রিকার বিষয়ও উঠে আসে।

ভারতীয় মজদুর সঙেঘর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সমিতি

গত ২৮ ডিসেম্বর তমলুক মহকুমার নিমতৌড়ি বিবেকানন্দ কে জি স্কুলে অনুষ্ঠিত জেলা বৈঠকে নূতন জেলা সমিতি গঠন করা হয়। প্রাদেশিক সম্পাদক কনক পানিগ্রাহী এবং প্রদেশ সংগঠন সম্পাদক অমরকৃষ্ণ ভদ্র ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

কমিটির পদাধিকারীরা হলেন —

সভাপতি- রাধাকান্ত ঘোড়াই, সহ-সভাপতি — অসিত কুমার পট্টনায়েক, বিনোদ বিহারী মান্না এবং সুগন্ধী মিশ্র, সাধারণ সম্পাদক — প্রভাকর চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ — অমরেন্দ্র জানা, কার্যকরী সদস্য — চন্দন বোস, সুকান্ত বেরা, রঘুনাথ মাইতি, ভবতারণ বর্মন, অলোক বর্মন, কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল এবং শ্রীমতি রাধা খাটুয়া।

বিজয়ী বিবেকানন্দের প্রত্যাবর্তন

আজ থেকে ১১২ বছর আগের ঘটনা। বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের প্রথম পদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল বঙ্গভূমির বজবজ। বিশ্ববাসীর হৃদয়ে যেদিন বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সেদিন থেকেই তাঁর বিশ্ববিজয় শুরু। সে ঘটনা আজ প্রায় সকলেরই জানা। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দের ১১-সেপ্টেম্বরের সেই উদাত্ত ঘোষণা — 'Sisters and Brothers of America'। শিকাগোর বুকে এই বিবেকবাণী যখন ঘোষিত হলো তখন বিশ্ববাসী বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হলো। খুঁজে পেল ভারতাত্মার চিরন্তন-সত্য শাশ্বত বেদান্তের মর্ম-সত্তাকে। সেই সঙ্গে উদঘোষিত হলো সনাতন ভারতের

স্বামী আত্মবোধানন্দ

সার্বজনীন ধর্মাদর্শের আত্মকথা — 'সকল ধর্ম সমভাবে সত্য।' প্রতীচ্যবাসী সম্বিত ফিরে পেল প্রাচ্যের নবীন হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রাণ জাগানিয়া বক্তৃতায়। যদিও সেই বাগ্মী প্রাচ্য যুবক পরিচয়পত্রের সূত্রে ছিলেন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি। কিন্তু তাঁর মর্মস্পর্শী কণ্ঠবীণায় উদ্‌গীত হলো বিশ্বধর্মের উদার মর্মবাণী। পাশ্চাত্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলো সার্বজনীন হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্বে মানবধর্মের নতুন তত্ত্ব। তাঁর বাণীতে প্রতিধ্বনিত ও প্রমাণিত হলো তিনি শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি নন, বিশ্বজনীন চিরন্তন -সত্য মানবধর্মের প্রতিভূরূপে। সকল ধর্মের রক্ষণশীল গন্ডী ভেঙে রচিত হলো এক উদার সার্বভৌম প্রীতিপূর্ণ মতবাদের স্মৃতিসৌধ।

ভ্রাতা-ভগিনী সম্বোধনে পাশ্চাত্য দুনিয়াকে একসূত্রে গ্রথিত করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রোতারাও খুঁজে পেলেন তাঁর ভাষণে সকল ধর্মের সারতত্ত্ব। করতালিতে অভিনন্দিত করল বিশ্ববাসী গৈরিকসন্ন্যাসীকে। ত্যাগের দীপ্তিতে বিশ্ববিজয়ের তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন বেদান্তমূর্তি বিবেকানন্দ। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন সারাবিশ্বে কপর্দকশূন্য বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। অবিসংবাদিতভাবে শিকাগো বিশ্ব-ধর্মমহাসভায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত হলেন। তিনি তখন বিশ্ববন্দিত বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হলেন। বিশ্ববিজয়ের রোমাঞ্চে র শিহরণ জেগে গেল তাঁর সর্বাঙ্গে। গৈরিক বসনে ভূষিত সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসীকে দেখে শ্রোতাসাধারণের অনুমিত হয়েছিল একজন প্রকৃতি বিজয়ী-যোদ্ধা-সন্ন্যাসী বলে।

তবে এই বিজয় শুধু বিবেকানন্দের জয় নয়। এ জয় সমগ্র ভারতাত্মার। এ যেন বিশ্বাত্মাকে জয় করল ভারতাত্মা। প্রাচ্য-সভ্যতার কাছে পাশ্চাত্য-সভ্যতার নতি স্বীকার। সেইসঙ্গে বিশ্ববাসীর হৃদয় জয়। বহুকালের একদেশদর্শী ধর্মধারণায় প্রতিষ্ঠিত হলো সমদর্শিতার উদার ভাবাদর্শ। উন্মোচিত হলো নতুন দিগন্তের প্রতিশ্রুতি — যা সর্বমানবের হিতৈষণায় উৎসর্গীকৃত। সেই প্রথম পশ্চিমী সভ্যতার আস্বাদনে এল সুসভ্য ভারত-সভ্যতার স্বাদ। এ যেন সেই সুপ্রাচীন বেদ-বেদান্তের কাছেনব্য-সভ্যতার আত্মনিবেদন।

বিজয়মাল্যে ভূষিত বাগ্মী বিবেকানন্দ আমেরিকার বড় বড় শহরে প্রচার করতে থাকেন সর্বজনীন বেদান্ত-ধর্মের মাহাত্ম্য। সেই মন্ত্রমুগ্ধকারী ভাষণে তিনি তখন সকলের হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত — 'The Hindoo Monk of India' বাগ্মিতায় তিনি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। তার সেই বলিষ্ঠ বক্তৃতায় সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা মুছে গিয়ে নির্মিত হলো প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনসেতু। সাম্প্রদায়িক হীনম্মন্যতা ছেড়ে সমগ্র মানবসমাজ হলো বিবেকানন্দ অনুরাগী। ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ তখন বিশ্বাত্মা — সমগ্র বিশ্বের, কোনও সম্প্রদায় বিশেষের নন।

বিশ্ববিজয়ের আনন্দোচ্ছ্বাসে এক এক করে উধাও হয়ে যায় তাঁর চার চারটি বছর পাশ্চাত্যদেশে। এবার জননী-জন্মভূমি তথা মাতৃভূমি ভারতবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা করার পালা। বীর সন্ন্যাসী পাশ্চাত্যে প্রবাস-যাপনের পর প্রাচ্যভূমি কলম্বো স্পর্শ করলেন ১৮৯৭-এর ১৫ জানুয়ারি। কলম্বো তখন ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত। স্বদেশ প্রত্যাগত কর্মবীর স্বামীজীর চোখে-মুখে সেদিন বিশ্ববিজয়ীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল। ভারতমাতার বরপুত্র বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর প্রত্যাগমনকে কেন্দ্র করে সমুদ্র তীরবর্তী সমগ্র অঞ্চল তখন জনসমুদ্রে পরিণত হলো। তাঁকে দর্শন-অভিলাষের আনন্দে আত্মাহারা উৎসুক ভারতবাসী। বিবেকানন্দের বিজয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল আকাশ-বাতাস। আকাশবাণীতে তরঙ্গায়িত হতে থাকলো বিবেকবার্তা।

এরপর স্বামীজিকে একে একে দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বর, রামনাদ, মাদুরা, ত্রিচিনাপল্লী, তাঞ্জোর, কুম্ভকোনম্ এবং মাদ্রাজে সাড়ম্বর অভ্যর্থনা-অভিনন্দনে ভূষিত করা হয়। দক্ষিণ ভারতে স্বামীজীকে ব্যাপক সম্বর্ধনায় অভিনন্দিত করা হলেও তাঁর জননী-জন্মভূমির প্রতি ছিল আরও গভীর আশা-আকাঙ্ক্ষা। তাঁর প্রাণের বঙ্গবাসীর প্রতি পরম-প্রত্যাশা নিয়ে প্রত্যাবর্তন।

তাই তিনি অচিরেই মাদ্রাজ থেকে 'মোম্বাসা' জাহাজে জন্মভূমি কলকাতার উদ্দেশে পাড়ি দিলেন। মোহনা পেরিয়ে 'মোম্বাসা' বাংলার বজবজে এসে নোঙর করল ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭-এর বৃহস্পতিবার রাত্রে। সে রাত্রি বজবজে জাহাজের বুকেই অতিবাহিত করতে হলো বঙ্গসন্তানকে। পরদিন ১০ ফেব্রুয়ারি

(এরপর ১৩ পাতায়)

অবতার পুরুষের পিতা

প্রজাপতি কশ্যপ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

পিতা হবেন তিনি। অথচ সেই পুত্রেরই কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকেন মহর্ষি কশ্যপ। ভাবী পুত্রেরই বন্দনা করতে থাকেন।

পরম পবিত্র সেই সিদ্ধাশ্রম। স্বয়ং বিষ্ণু এখানে তপস্যার জন্য বাস করেছিলেন বহু বছর। পত্নী অদিতিকে নিয়ে মহর্ষি কশ্যপ সেই পুণ্য স্থানেই এসে স্তব করতে থাকেন বিষ্ণুর।

বিষ্ণু আগামী দিনে তাঁর পুত্র হয়ে জন্মাবেন। এটাই পূর্ব-নির্দিষ্ট। মহর্ষি কশ্যপ যে এটা জানেন না তা নয়। তবুও ঈশ্বরকে লাভ করার যে পথ, সেই পথেই জীবন পরিক্রমা মহর্ষি কশ্যপের। যিনি হবেন পিতা, যাঁর স্তব করবে পুত্র, সেই পুত্রেরই বন্দনায় রত হলেন কশ্যপ।

বিচিত্র এই ব্যবহার, আপাতদৃষ্টে তাই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে জগৎকে শিক্ষা দিতেই, সকলের সামনে নজির গড়ে তুলতেই বুঝি কশ্যপকে দিয়ে এই লীলাভিনয় করলেন স্বয়ং ঈশ্বর — ভগবান বিষ্ণু। সেই লীলা নাটকের একটি বিশিষ্ট চরিত্র হয়ে কশ্যপ তাই গদগদ কণ্ঠে বলতে থাকেন — হে পুরুষোত্তম, তোমাকে আমি দেখছি তপস্যায় ভাস্বর। দেখছি, তুমি তপোময়। তপমূর্তি তুমি। তোমাতেই প্রমূর্ত তপস্যা। তপস্যাই তোমার আত্মা। অথবা তপস্যাই তোমার অবয়ব স্বরূপ। তোমার শরীরেই বিদ্যমান এই নিখিল জগৎ। তোমাতেই মূর্ত ত্রিভুবন।

হ্যাঁ তেমনটাই দেখছি আমি। অনাদি, অনন্ত তুমি। অনন্তরূপ তোমার বর্ণনা করতে পারে না কেউ। তাই বৃথা সে চেষ্টা না করে, আজ আমি শরণ নিচ্ছি তোমারই প্রার্থনা। প্রসন্ন হও তুমি। তুষ্ট হও তুমি। কৃপা করো আমাকে।

পরম পবিত্র ধাম সেই সিদ্ধাশ্রমে আসার আগে অদিতিকে নিয়ে হাজার বছরের

এক ব্রত শেষ করেছেন কশ্যপ। সেই ব্রত শেষ করার পরই তিনি এসেছেন এখানে। এসেই বন্দনা করতে থাকেন বিষ্ণুর।

তাঁর সেই আন্তরিক, ভক্তিপ্লুত স্তবে খুশি হলেন ভগবান বিষ্ণু। অন্তরের প্রীতি সন্ধ্যারাগের মতোই ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সারা মুখে। এক দিব্য প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত বিষ্ণু বলতে থাকেন — হে মঙ্গলমূর্তি ঋষি, ইচ্ছে থাকলেও সকলকে বর দেওয়া যায় না। কৃপা করাও যায় না। ফুটো পাত্রে জল ঢাললে সব জলই বের হয়ে যায় তা থেকে। একইভাবে কৃপার যোগ্য যে হয় না তাকে কৃপা করলেও সে কৃতার্থ হতে পারে না। নিজের যোগ্যতার অভাবের জন্যই কৃপার যথার্থ রূপটি বুঝতে না পেরে অবহেলায় নিজেই সরে যায় কৃপাসূর্যের আলো থেকে।

হে মহর্ষি কশ্যপ, আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি সে ধরনের কোনও ফুটো পাত্র নও। বরং বলা যায়, তুমি যোগ্যতম। তাই প্রার্থনা করো বর। আজ তোমার সব আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ করবো আমি।

ভগবান বিষ্ণুর সেই কথা শুনে, ঋষি কশ্যপ বলেন, যদি সত্যিই কৃপা করবে বলে ঠিক করে থাকো, তাহলে আমার একটাই প্রার্থনা। সেই প্রার্থনা পূরণ করো তুমি।

আমি তো কথা দিয়েছি তোমাকে। তাই জানাও তোমার প্রার্থনা।

প্রার্থনা একটাই। আমার পুত্র হও তুমি। তোমার পিতা ও মাতা হয়ে ধন্য হই আমি এবং অদিতি। আমি জানি, তোমার কৃপায় শুধু আমি নয়, ধন্য হবে দেবতারাও। দেবরাজ ইন্দ্র কৃতার্থ হবে তোমার এই কৃপায়। তাই ইন্দ্রের ছোটভাই হয়ে আবির্ভূত হও তুমি।

কশ্যপের সেই প্রার্থনায় সদাহাস্য বিষ্ণু বলেন, ব্রহ্মার মানসপুত্র তুমি। তুমি মহর্ষি। বীতপাপ তুমি। তোমার মতো ব্যক্তিই এমন নিঃস্বার্থ বর প্রার্থনা করতে পারে। বলতে কী, তুমি মুখ ফুটে প্রার্থনা করার আগেই আমি তোমার পুত্র হবার সংকল্প করেছি। এখন তুমি সেই বরই চাওয়ায় খুশিই হলাম। খুশি মনেই বলছি, পূর্ণ হবে তোমার মনোবাসনা। আমি ইন্দ্রের ছোটভাই উপেন্দ্র হয়ে জন্ম নেবো তোমার ঔরসে। মাতা অদিতির গর্ভে।

ধন্য হলেন ঋষি। আনন্দিত অন্তরে বিষ্ণু নামেই মত্ত হলেন তিনি। আর এরই কিছু দিন পরে দৈত্যরাজ বলির নির্যাতন থেকে দেবতাদের রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হলেন তিনি বামন রূপে। মহর্ষি কশ্যপ। ব্রহ্মার পুত্র তিনি। তাঁরাই নির্দেশে প্রজা সৃষ্টি মহাযজ্ঞের সার্থক ঋত্বিক তিনি। কশ্যপ ঋষি। সত্যদর্শী ব্রহ্মার আদেশেই সৃষ্টিতে বসেন কশ্যপ। বিয়ে করেছিলেন দক্ষের তেরোটি মেয়েকে। অবশ্য তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। স্ত্রীদের নাম নিয়েও আছে কিছুটা বিরোধ। তবে অদিতি এবং দিতি যে তাঁর দুই স্ত্রী, একথা জানেন সকলেই। অদিতির সন্তানরা হলেন দেবতা আর দিতির সন্তান দৈত্য। তাই বা কেন। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর পিতা তিনিই। তাঁরই ঔরসে জন্ম নেয় দৈত্য থেকে দেবতা। মানুষ থেকে ইতর প্রাণী, পাখি থেকে সাপ, কুকুর থেকে হরিণ ইত্যাদি সকলেই।

এতগুলি স্ত্রী, তাবৎ প্রাণীকূল সন্তান। তবু কশ্যপ আসক্তিহীন। বীতরাগ, বীতশোক, নিষ্কাম, নিস্পৃহ। আর এরই জন্য ব্রহ্মা একবার যজ্ঞ শেষে সমস্ত পৃথিবীটাকেই দান করেন কশ্যপকে।

ব্রহ্মা দান করলেন। কশ্যপ গ্রহণও করলেন। কিন্তু যাকে দান করা হল, সেই পৃথিবী পাতালে গিয়ে কাঁদতে থাকেন। পৃথিবীকে ওভাবে কাঁদতে দেখে কশ্যপ তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বৃথা। পৃথিবী

(এরপর ১৩ পাতায়)

সুচ-সুতোর মেলবন্ধনে

অনন্য শিল্পের সাধনায় নমিতা চক্রবর্তী

ইন্দিরা রায়।। মামার বাড়ির শিল্পকর্মের প্রভাব, দিদির অনুপ্রেরণা এবং সর্বোপরি মায়ের হাতের কাজ, সেলাই-এ বিমূর্ত হয়ে ওঠা গ্রামের দৃশ্য — ছোট থেকেই আকর্ষণ করত সেই মেয়েটিকে, যিনি আজকের অনন্য সূচিশিল্পের অধিকারী নমিতা চক্রবর্তী।

প্রকৃতির গান। (ইনসেটে নমিতা চক্রবর্তী)

বাবা মেয়ের আঁকা ও অন্যান্য হাতের কাজ পছন্দ করতেন, কিন্তু আর্ট-এর লাইন নিয়ে পড়াশোনা পছন্দ করতেন না। অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার গড়ে তোলার ওপর জোর দিতেন। তাই, পড়াশোনার পাশাপাশি অবসরে চলত হাতের কাজ। এ ব্যাপারে নিজস্ব সহজাত প্রতিভা কাজ করত, কোনও প্রশিক্ষণ ছিল না। বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাঠক্রমে যে 'সেলাই' ছিল, সেটুকু শিখেছিলেন। তবে নিজের তাগিদে কারোর কিছু হাতের কাজ, কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্য, ভাল ছবি দেখলেই তা নিজের মনে এঁকে নিতেন। অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার তৈরি করার শেষ ভাগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হুগলির হরিপালে শুরু হল বসবাস। সেখানকার খোলামেলা পরিবেশ তাঁর ভাল লাগত। ছোট থেকেই বাবার কর্মস্থলে, বিভিন্ন জায়গায় থাকার ফলে বিশেষত উত্তরবঙ্গের সেইসব স্থানের সৌন্দর্য সর্বদাই হাতছানি দিত, তৎক্ষণাৎ তিনি তা তুলে রাখতেন। ছবিতে তো বটেই, তাঁর সঙ্গে সুচ -সুতোর মেলবন্ধনে। গৃহবধূ হয়েও এম এ, বি এড পর্যন্ত করেছেন। মাঝে মাঝে নিজের কল্পনাকে, প্রকৃতির জগৎকে তাঁর আঁকা এবং সেলাই-এ তুলে ধরেছেন। এরই মধ্যে সেলাই-এ লেডি ব্রাবোর্ণ ডিপ্লোমা লাভ করেন। 'ছবি আঁকার ব্যাকরণ জানি না' বলে নিজেকে বারবার মনে করেন। তাই, তাঁর শিল্পকর্ম প্রকাশ্যে কখনও তুলে ধরেননি। কিন্তু তাঁর অনবদ্য শিল্পকর্মে এটাই বৈশিষ্ট্য যে,

উনি তুলির টান দিয়ে উজ্জ্বল রঙের কাপড়ের ওপর নানা সুতোর কাজ প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। আঁকা ও ছবির সমন্বয়ে কাজকে তিনি আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। ছোটদের বিভিন্ন বিষয় এবং, প্রাকৃতিক দৃশ্য, অ্যাকোয়ারিয়াম, অ্যাকোয়াটিকা, ফুল, মা কালীর বিভিন্ন রূপ তাঁর হাতের কাজে বিমূর্ত। উজ্জ্বল রঙের সুতোর ব্যবহারে প্রতিটি বিষয়ই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ছোটদের ভাবনা মনে আসার কারণ, ছোটদের নিয়ে তিনি সারাদিন থাকেন। তারকেশ্বরে 'শিশু নিকেতন'-এ শিক্ষকতা করতে করতে আজ প্রধান শিক্ষিকার পদে। ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়াশোনার পাশাপাশি নানা ধরনের হাতের কাজ শেখানো হয়। নিজে শিখে পাঁচজন মহিলাকে শিখিয়ে তুলতে চান নমিতা চক্রবর্তী। 'কিন্তু বেশ কিছু স্থানীয় মহিলাকে শিখিয়েছিলেন বিনা বেতনে এবং তাদের হাতে কাপড় তুলে দিয়ে। কিন্তু এখানকার গ্রাম্যতা এতটাই যে, এই শিক্ষা ওদের কাছে মূল্য পেল না।'

তাঁর শিল্পকাজে সাধারণত নানা ধরনের স্টিচ বিমূর্ত। এছাড়া বাটিক, ফেব্রিক, সূচীশিল্প, উলবোনা, মূর্তি তৈরিতেও তাঁর অনায়াস দক্ষতা। সব সময়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করার চিন্তা মাথায় ঘোরে। তাঁর শিল্পশৈলীর প্রথম প্রকাশ ঘটে অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টসে। এরপর সম্প্রতি ২০০৮-এর নভেম্বরে উত্তর কলকাতায় লেকটাউনে অরুণ চক্রবর্তীর গ্যালারি 'সুনয়নে' প্রদর্শনী হয়ে গেল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সংস্ অফ্ নেচার, কালী দ্য মাদার, অ্যাকোয়টিকা, অ্যাকিউরিয়াম, দি কাইট, ফ্লাওয়ার ইত্যাদি নানা বিষয়।

নানা সংস্থার সঙ্গে জড়িত থাকতে ভালবাসেন। তাই তো 'স্বজন' নামে একটি যৌথ উদ্যোগে গড়ে তোলা এন জি ও-তে ২০০৩ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত জড়িত ছিলেন। এখনও কাজ করে যেতে চান। 'শিশু নিকেতন' স্কুলকে নিজের সন্তানের মতো ভালবাসেন, কিন্তু কাজ করে যেতে চান। কিছু স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী চাইলেও মালিকানা অন্যের। দেখা যাক্, ছোটদের ভালবাসার টানে কতদূর কি করা যায়।

সাংসারিক চাপ ও শহর থেকে দূরে থাকায় অভিনব শিল্পের প্রকাশ বা প্রচার সেভাবে হয়নি। এছাড়া শিল্পী নিজেও প্রচার বিমুখ। আপন মনে কাজ করে যেতেন। এত ধৈর্য ধরে এ ধরনের সূক্ষ্ম কাজ করার অবসর কখন পান — এ কথার উত্তরে জানান ঃ বিশেষ কোনও সময় নেই। সারাদিনের কাজের পর অবসর পেলেই বসে পড়ি সেলাই নিয়ে। মনের মধ্যে প্রতিনিয়ত নতুন

নতুন ভাবনা আসে। তাকে চেষ্টা করি সেলাই-এ কাজে লাগাতে। স্টিচে কিছু লেখা, অনেক সময়ে নিজেই নতুন কিছু করি এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে।'

শিল্পীর পরম্পরায় পুত্র শিল্পী হয়েছে। তবে সে কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। পুত্রবধূও তাই। তারা নিজেদের কাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। নমিতা চক্রবর্তী অবসরপাপ্ত হয়ে সেলাই-এর কাজে শুধু নিজে নয়, ছোটদের এবং বড়দের বিশেষত দুঃস্থ মহিলাদের সেলাই শিখিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলতে চান।

খোলামেলা পরিবেশে বড় হওয়ায় বেশি কোলাহল মুখরতা এড়াতে চান। প্রচার বিমুখ শিল্পী আপনমনে নিজের কাজের জগতে নিমগ্ন থাকতে ভালোবাসেন। যদি কেউ আগ্রহী হন;যোগাযোগ করতে পারেন। দূরভাষ — (০৩২১২) ২৭৬৫৩৯, মো- ৯৪৩৪৫০০২৬১৮

চিত্রকথা ।। ভক্ত ও ভগবান ।। উনত্রিশ

মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ১০৫তম জন্মোৎসব পালিত হল কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল ডঃ শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ১০৫ তম জন্মোৎসব। এই উপলক্ষে গত ২৪ থেকে ২৮ ডিসেম্বর কলকাতার ভি. আই. পি রোডের শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গনে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর জন্মোৎসব পালনের পাশাপাশি শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী বর্ষ পূর্তি উৎসবও পালিত হয়।

পাঁচ দিনের এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন উৎসব মুখর হয়ে উঠেছিল। ২৪ ডিসেম্বর সংস্থার পক্ষ থেকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। বেশ কিছু ভক্ত রক্তদান করেন। ওই দিন বিকেলে শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ২৫ ডিসেম্বর ছিল আচার্যদেবের ১০৫ তম আবির্ভাব দিবস। ওই দিন সকাল থেকে শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গনে ভক্তদের ভিড় উপছে পড়ছিল। বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভক্তদের ভিড়ও বেড়েছে। সারাদিন নানা ধরনের অনুষ্ঠান চলছিল অঙ্গনে। মঙ্গলাচরণ ও মঙ্গলারতি করেন সংগঠনের সম্পাদক উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী ও শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী। সকাল থেকে সন্ধ্যে— মন্দিরে চলেছিল মঙ্গল আরতি, পূজা-পাঠ। প্রভাতফেরী ছিল দেখার মতো।

শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গনে রাধাগোবিন্দের অষ্টকালীন লীলা স্মরণকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ ডিসেম্বরের এই অনুষ্ঠান শুনতে অংশ

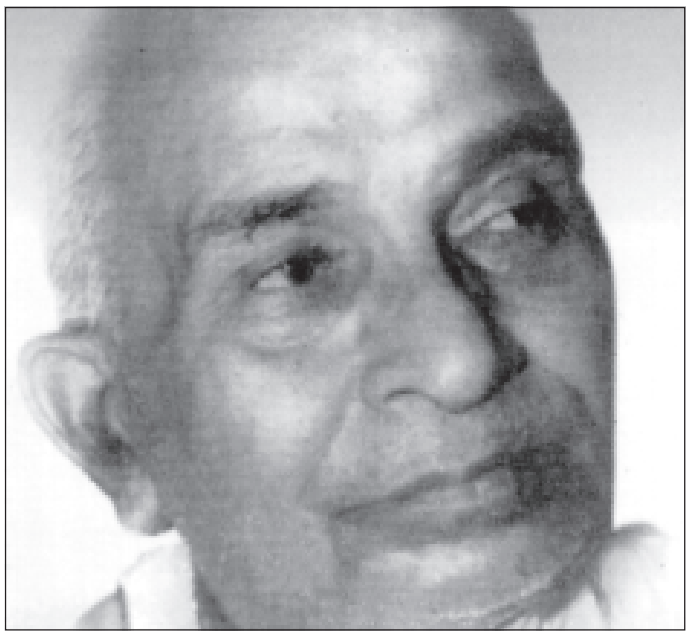

নিয়েছিল ভক্তরা। ২৭ ডিসেম্বর সকালে শ্রীসমাধি মন্দিরে কুঞ্জভঙ্গ কীর্তন হয়। দুপুরে শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের পূজা হয়। সেইসঙ্গে প্রসাদও বিতরণ করা হয়। বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় পদাবলী কীর্তন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে ২৮ ডিসেম্বর গঙ্গাবক্ষে চলমান সুসজ্জিত লঞ্চে অভিনব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লঞ্চে চলে পূজা-পাঠ, কীর্তন। শোভাবাজার গঙ্গাঘাট থেকে সকাল ৯টায় পাঁচটি লঞ্চ ডায়মণ্ডহারবারের উদ্দ্যেশ্যে রওনা দেয়। ফিরে আসে বিকেল ৫টায়। সুসজ্জিত লঞ্চে প্রায় শতাধিক ভক্তের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই ধরনের অভিনব উৎসবে যোগ দিতে পেরে খুশি ভক্তরা।

বিষাক্ত কালনাগ আই এস আই

(৯ পাতার পর)

তৎপর —— সেটি হল ভারতে জাল নোট ছড়ানো। যার কথা আগেও বলা হয়েছে। মার্চের শেষের দিকে মুম্বাই-এর তৎকালীন পুলিশ কমিশনার এস এন সিং জানান — আই এস আই রোজ ভারতে ৫০ লাখ টাকার জাল নোট ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই নোটগুলি নিপুণভাবে ছাপা হয় পাকিস্তান সরকারের মিন্ট-এ।

পাকিস্তান যে কী ভয়ানকভাবে মরিয়া ভারতকে নানাভাবে ক্ষতি করার জন্য তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় যখন পাকিস্তানী ডিপ্লোম্যাট মোহম্মদ আর্শাদ চীমাকে ১৬ কেজি আর ডি এক্সসহ কাঠমাণ্ডুতে গ্রেপ্তার করা হয় ১২ এপ্রিল ২০০১। পরের দিন ভারতের গৃহমন্ত্রক সূত্র থেকে জানা যায় — কাঠমাণ্ডুর পাক-দূতাবাসে চীমা ফার্স্ট সেক্রেটারী (কাউন্সেলর)। চীমা দু'জন পাক কর্মচারীর অন্যতম যে ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর হাইজ্যাক করা ভারতীয় বিমান আই সি৮১৪র হাইজ্যাককারীদের ত্রিভুবন এয়ারপোর্টে সাক্ষাৎ করেছিল। ১২ এপ্রিল কাঠমাণ্ডুর পুলিশ চীমাকে আর ডি এক্সসহ গ্রেপ্তার করে।

ভারতের গৃহমন্ত্রক আই এস আই-র সঙ্গে চীমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত। ভারতে ৫০০ টাকার জালনোট ছড়াবার কাজেও চীমা বিশেষভাবে জড়িত। মনে করা হয় ত্রিভুবন এয়ারপোর্টে চীমা একটি ব্রিফকেসে করে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হাইজ্যাককারীদের হাতে তুলে দিয়েছিল। এয়ারপোর্টে যাবার সময়ে ব্রিফকেসটি তার হাতে ছিল। ফিরে আসবার সময়ে ছিল না।

নেপাল আই এস আই-এর শক্ত ঘাঁটি — উপরের ঘটনা আবার তা প্রমাণ করে। ১৩ এপ্রিল চীমা ও তার স্ত্রী রুবির আটকের সংবাদ নেপালি মিডিয়ায় প্রচারিত হলে নির্লজ্জ পাকিস্তান সরকার ভিয়েনা কনভেনশন ভঙ্গের জিগির তোলে। তিন বছর আগে এক হোটেল থেকে ২০ কেজি আর ডি এক্স আটক করার ঘটনার সঙ্গে চীমা জড়িত। চীমা নেপালে "আই এস আই বস্" বলে পরিচিত। আর ডি এক্স (বিস্ফোরক পদার্থ) রাখবার অপরাধে চীমা বহিষ্কৃত হয়ে ১৪ (২০০১) এপ্রিল নেপাল ত্যাগ করে।

পাক-আই এস আই-এর সব পরিকল্পনা যে সবসময়ে ঠিকভাবে কাজ করেন না তার নাটকীয় প্রমাণ পাওয়া যায় প্রায় ঠিক ওই সময়েই পাঞ্জাবের একটি ঘটনায়। 'খালিস্তান কমান্ডো ফোর্সের' প্রধান ওয়াসান সিং জাফ্ফারওয়াল ১১ এপ্রিল পাঞ্জাব পুলিশের হাতে অমৃতসরে ধরা পড়ে। অবশ্য 'ধরা পড়া' ব্যাপারটি নিয়ে বিতর্ক বা দ্বিমত আছে। অনেকের মতে — জাফ্ফারওয়াল ইচ্ছে করেই ধরা দিয়েছে। বর্ডার রেঞ্জ ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ্পুলিশের এ পি পান্ডের বক্তব্য অনুযায়ী — আর্থিক অসঙ্গতি ও দেশের স্মৃতি মেদুরতা তার ধরা পড়ার কারণ। 'খালসা রাজ', আকালি রাজনীতি, 'পান্থিক কমিটি'-র সিদ্ধান্ত — নানা মতবাদ ধরা পড়ার পেছনে সোচ্চার হলেও পাক — আই এস আই যে এ-ব্যাপারে অত্যন্ত অখুশী এবং এটা যে তাদের কাছে 'সাইকোলজিক্যাল সেট্ ব্যাক্' তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আই এস আই তার পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। সুইজারল্যান্ড যাবার আগে সে আই এস আই-এর আতিথ্য ভোগ করেছে। এখন আই এস আই সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সে সরবরাহ করতে পারে, বিশেষ করে পাঞ্জাব সম্বন্ধীয়, ভারত সরকারকে, যা তাদের আর এক মাথাব্যথা। এক সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তরপ্রদেশের ডি জি পি (ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ) ১৮ এপ্রিল মীরাটে, আই এস আই-এর সঙ্গে সিমির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সিমি একটি ছাত্র সংগঠন বলে তখন এটির নিষিদ্ধ করণ কঠিন বলেও তিনি জানান। প্রসঙ্গত সিমি বর্তমানে নিষিদ্ধ।

২১ এপ্রিল মধ্য দিল্লীর নবি করিমবাসী দু'জন লোককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেন যারা আই এস আই-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ৫০০ ও হাজার টাকার নকল নোট ছাপিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল। নোট ছাপাবার জিনিসপত্রও তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। এদের একজন মহম্মদ ওয়াসিমকে ধরা হয় কনট প্লেসের ওডিয়ম সিনেমার কাছ থেকে। তার কাছে ছিল এক লাখ টাকার জাল নোট — প্রতিটি এক হাজার টাকার। এই জাল নোট বিক্রির জন্যে অন্য একজন লোকের অপেক্ষা করছিল সে। তার কাছ থেকেই পুলিশ জানতে পারে নবি করিম আড্ডার কথা, যেখানে ছাপা হতো জাল নোট। ওয়াসিমের অপর সঙ্গী সুনীল কুমারকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছে ছিল চার লাখ টাকার জাল নোট। হানা দিয়ে পুলিশ কমপিউটার, স্ক্যানার এবং ছাপাবার যন্ত্রপাতি পায়।

এরপরে ২৩ এপ্রিল সন্ধ্যেয় পুলিশের স্পেশাল সেল আজমেরি গেটে ইউ পি রোডওয়েজের বাস স্ট্যান্ড থেকে মজিদ খান ওরফে ওসমান (২৫) এবং ইনহিসার আহমেদ (৩৫) নামে পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদে ট্রেনিং প্রাপ্ত দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছে ছিল অল্প পরিমাণে আর ডি এক্স, একটি ডিটোনেটর এবং ৫০ হাজার টাকার জাল নোট। পাক-অধিকৃত মুজাফ্রাবাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় ব্যাপক ট্রেনিং পাবার পর পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজে ইসলামাবাদ থেকে মজিদকে কাঠমাণ্ডু পাঠানো হয় এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে। গোরখপুর-নেপাল সীমান্ত পার হয়ে সে দিল্লী আসে। দিল্লীতে কিছুদিন তারা গেস্ট হাউসে কাটায়। দিল্লীতে মজিদ আই এস আই-এর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিল। ভারতে এসে সে ইনহিসার আহমেদকে সঙ্গী করে। কাঠমাণ্ডুতে আই এস আই-এর নির্দেশানুযায়ী সে ভারতে জাল নোট চালু করত। জাল নোটগুলি পাওয়া গিয়েছিল ক্যানভাস স্যু'র মধ্যে, আর ডি এক্স, ডিটোনেটর একটি টু-ইন-ওয়ান সেটের মধ্যে। (চলবে)

বিবেকানন্দের প্রত্যাবর্তন

(১১ পাতার পর)

প্রভাতের প্রথম সূর্যকিরণ সম্পাতের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি বজবজের বুকে পদার্পণ করলেন — প্রথম স্পর্শ করলেন বাংলার মাটি। ধন্য হলো বঙ্গভূমি বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ স্বামীজির পূত পদরজে। গর্বিত বঙ্গবাসী বজবজ থেকে স্বামীজিকে সাদরে কলকাতায় আনার জন্য একটা স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সদলবলে বজবজ জাহাজ-বন্দর থেকে আসলেন বজবজ রেল স্টেশনে (বর্তমানে পুরাতন স্টেশন)। সেখান থেকে বিশেষ সুসজ্জিত ট্রেনযোগে 'শিয়ালদহ' স্টেশনে এসে পৌঁছলেন সকাল সাড়ে সাতটায়। সহযাত্রী মিষ্টার গুডউইন, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার, মিসেস্ সেভিয়ার, আনন্দচালু এবং গুরুভ্রাতা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে নিয়ে। শিয়ালদায় প্রায় কুড়ি হাজার কলকাতাবাসী গগনভেদী বিজয়ধ্বনিতে অভ্যর্থনা জানিয়ে পুষ্পমাল্যে স্বামীজিকে অভিনন্দিত ও স্বাগত জানালেন। বিশ্ববন্দিত স্বামী বিবেকানন্দও সমবেত সকল অভ্যাগতকে করজোড়ে জানালেন প্রাণভরা সাফল্যের অভিবাদন।

সেই ১৯ ফেব্রুয়ারির বিবেকানন্দের প্রত্যাবর্তনকে স্মরণ করে আজও স্বামীজির প্রতিকৃতিসহ পুষ্পমাল্যে ভূষিত একটা বিশেষ ট্রেন বজবজ থেকে শিয়ালদহে আসে একইভাবে — একই ধারায় — একই দিনের — একই সময়ে। কিন্তু আজ কী আমরা — 'জয় স্বামী বিবেকানন্দ কী জয়' বলে সেভাবে মুখরিত করে তুলতে পারি বাংলার আকাশ-বাতাস? পেরেছি কী সেই বিবেকবীণায় সুর মেলাতে? বঙ্গবাসীর প্রাণসত্তায় কী আজও উদ্ঘোষিত হচ্ছে সেই বিবেকবার্তা?

প্রজাপতি কশ্যপ

(১১ পাতার পর)

শান্ত তো হন-ই না, বরং বেড়ে যায় কান্না। কী করলে শান্ত হবে পৃথিবী তা প্রথমটায় বুঝতেই পারেন না কশ্যপ। অবশ্য পরে মনে পড়ে তাঁর, তপস্যায় হয় না — এমন কোনও জিনিসই নেই ত্রিভুবনে।

কথাটা মনে হতেই কঠোর তপস্যায় বসলেন ঋষি কশ্যপ। কেটে গেল অনেকগুলো বছর। তারপর একদিন তপস্যা থেকে উঠে তিনি গেলেন পৃথিবীর কাছে।

না, এবার আর পৃথিবী কাঁদেন না। বরং কী এক আনন্দে যেন টগবগ করে ফুটতে থাকেন।

পৃথিবীকে শান্ত হতে দেখে তপস্যায় ইতি দেন কশ্যপ। পাঁকে থেকেও পাঁক মাখে না পাঁকাল মাছ। কথাটা অজানা নয় কারও। কিন্তু এই পৃথিবীতে যে এমন ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে এটা অনেকেই ভাবতে পারেন না। এই ভাবতে না পারাদের শিক্ষা দিতে কসুর করেননি কশ্যপ। আর ঠিক এই কারণেই পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীর পিতা হয়েও কশ্যপ ঋষি। মহর্ষি। আবার অবতার পুরুষের পিতা হয়েও কশ্যপ যেন রক্তমাংসের মানুষের মতোই কখনও উদ্বেগে ব্যাকুল, কখনও বা অন্যায় জেনেও পূরণ করেছেন স্ত্রীর আবদার। এটাই বুঝি মানুষের ধর্ম। তাই বোধহয় মানবজীবন এক নাটক। নাটকের ধর্ম মেনেই কশ্যপ আবার উদাসীন। পৃথিবীর সকলের জনক হয়েও অহঙ্কার শূন্য তিনি। দেবতা এবং জগতের কল্যাণে সব সময় ডুবে থাকতেন। ধ্যানে — ধ্যানের মধ্য দিয়ে আস্বাদন করেন পরমানন্দকে। স্থান কাল পাত্র নিরপেক্ষ হয়ে কশ্যপ এক আনন্দপুরুষ। নিজে আনন্দে থেকেছেন — অন্যকে আনন্দ দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ আজও সমান জনপ্রিয়

দীপেন ভাদুড়ী

যাঁরা নাটকে অভিনয় করতে এবং দেখতে ভালোবাসেন, তাঁরা জীবনে কতবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ডাকঘর” নাটকে অভিনয় করেছেন এবং দেখেছেন তা হিসেব করে বলা তাঁদের পক্ষেও সম্ভব নয়। নাটকটি দেখেননি এমন নাট্যমোদী বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই প্রতিবেদকও অনেকবার ডাকঘর নাটকে অভিনয় করেছেন এবং দেখেছেন। তা সত্ত্বেও আবার ডাকঘর নাটকটি দেখতে গেলেন কেন?

রবীন্দ্রনাথের যে কোনও নাটক তাঁর চিন্তা, তাঁর ভাবনার বাইরে বেরিয়ে আসার মতো ধৃষ্টতা বোধহয় কোনও নাট্যপ্রেমীর পক্ষে প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। প্রতিবেদক শুনেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে এই নাটকটি উপস্থাপনা করেছেন পরিচালক প্রদীপ রায়চৌধুরী। ই জেড সি সি আয়োজিত ১৯,২০,২১ নভেম্বর ’০৮ নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পূর্বশ্রী হলে (ই জেড সি সি) সল্টলেক-এ। তিন দিনই গোবরডাঙার “রূপান্তর”, “শিল্পায়ন”, “নকশা” গোষ্ঠী তিনটি নাটক পরিবেশন করে।

প্রথমদিন ছিল “রূপান্তর” অভিনীত রবীন্দ্রনাথের “ডাকঘর” নাটকটি। সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, নাটকটি উপস্থাপনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন পরিচালক, সম্পাদক প্রদীপ রায়চৌধুরী। মূল ভাবনা মাথায় রেখে মাঝে মাঝে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুষ্ঠ প্রয়োগ এবং রাণার-এর উপস্থাপন নতুন স্বাদ এনে দেয়। অথচ মূল সুর আঘাত প্রাপ্ত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের কথায় “অমল হল সেই মানুষ যার আত্মা মুক্ত পথের আহ্বান শুনেছে....। কবিরাজের পরামর্শ বিষয়ী লোক মাধব দত্ত তার চঞ্চ লতাকে মারাত্মক রোগের লক্ষ্মণ বলে ধরে নিল এবং অমলকে শরতের রৌদ্র আর হাওয়া থেকে বাঁচিয়ে ঘরের বন্ধনের মধ্যে ধরে রাখতে চাইল.....। রাজবৈদ্য এসে জানালা খুলে ফেললেন .... তাই অমলকে আত্মার মুক্তালোকে স্বচ্ছন্দ জন্মের অধিকার এনে দিল”।

বর্তমানে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দখলের আগ্রাসী মনোভাব, আতঙ্কবাদীদের ধবংসের এই লীলা খেলার সময়, রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরের মুক্তির আলোয় আলোকিত হওয়া এবং সংশোধন হওয়া ত্বরান্বিত করার এক বিশেষ উপায় এই নাটকের ভিতর নিহত আছে। আরও আছে মুক্তির পথের সন্ধান। ভালোবাসা মানুষের শ্রেষ্ঠতম পাথেয় হওয়া উচিৎ — একথা ডাকঘর নাটকের ভিতর পরিবেশিত হয়েছে। মোড়লের ন্যায় সমাজের অনিষ্টকর চরিত্র চিরকাল সমাজে ছিল, রয়েছে, থাকবে। তবে সেসব চরিত্র সমাজের বিশেষ ক্ষতি সাধন করতে পারে না। এ কথাও প্রতিষ্ঠা করেছেন রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে। সব সময় সত্যের জয় হয় — শয়তানের শয়তানী পরাজিত হয়।

‘ডাকঘর’ নাটকের একটি দৃশ্য।

অমলের ভূমিকায় তৃষিতা-র অভিনয় অনবদ্য। দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে মাধব দত্ত — বিমল আচার্য, ঠাকুরদা — শ্যামল দত্ত, সুধা — প্রিয়াংকা চক্রবর্তী, মোড়ল —আশিস পাল-এর অভিনয় দর্শকদের ভালো লাগবে। আলো — বিজয় চট্টোপাধ্যায়, আবহ —মুরারী রায়চৌধুরীর সংযত।

১৯৭৩ সাল থেকে গোবরডাঙা ‘রূপান্তর’ গোষ্ঠী একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নাট্যচর্চা করে চলেছে এবং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করে চলেছে। তাদের বহুল প্রচারিত “হারাধনের দশটি ছেলে” এক সময় পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলার বাইরেও প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নতুন নাটকের আশায় আমরা রইলাম।

সংরক্ষণের অভাবে হারাতে চলেছে কালজয়ী বাংলা সিনেমা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বিশ শতকের শেষার্ধের চলচ্চিত্রগুলো আজও হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। সেগুলি সর্বদা এভারগ্রীণ। আর উত্তম কুমারের ছবি হলে তো কথাই নেই। তবে শুধু উত্তম কুমার কেন, সৌমিত্র, বিকাশ, শুভেন্দু, অনুপ কুমার তাঁরাও তো কম যায় না। সিনেমা জগতের এক একজন দিকপাল। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল-এর পিতৃস্থানীয় চরিত্রে অভিনয় এখনও অমিল। পুরনো সেইসব সিনেমার কোনও বিকল্প হয় না।

সপ্তপদী, হারানো সুর, সাড়ে ৭৪, মেঘে ঢাকা তারা এমন বহু কালজয়ী সিনেমা একবার দেখতে শুরু করলে উঠে যেতে ইচ্ছা করে না। দুর্গাপুর রোডের ওপর দিয়ে বাইক চালালে সপ্তপদীর সেদৃশ্য আজও মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। ভারতীয় চলচ্চিত্রকেও সমৃদ্ধ করেছে সেদিনের বাংলা সিনেমাগুলি। সেগুলি থেকে নবাগত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রশিক্ষণের রসদ পায়। এসবই চলচ্চিত্র জগতের গুরুত্বপূর্ণ দস্তাবেজ।

অথচ তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের গড়িমসিতে হারাতে চলেছে সেইসব সিনেমা। হয়তো আর সেইসব সিনেমা দেখতে পাওয়া যাবে না। জলঘোলা কম হচ্ছে না টালিঘরেও। সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে চলেছে এভারগ্রীণ সিনেমাগুলি। সম্প্রতি পথের পাঁচালির রঙিন পরিবেশন নিয়ে বিতর্ক বেঁধেছিল টালিগঞ্জে। মুম্বাই-এর সংস্কৃতি ক্রিয়েশাল নামে একটি সংস্থা পুরনো দিনের সিনেমা রঙিন করার কাজ শুরু করে। চুক্তি হয় তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সঙ্গে। কাজও এগোয়। কিন্তু মাঝ পথেই চুক্তি ভঙ্গ হয়। খোদ তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরই চুক্তিটি বাতিল করে। জানানো হয় ছবিগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। সংরক্ষণের কাজেও রয়েছে বিস্তর বাধা। বহু ছবিরই রিল অবহেলায় নষ্ট হতে চলেছে। এছাড়া রয়েছে বই-এর শর্তাধারী নিয়েও সমস্যা। শর্তাধারীদের অনেকেই বেঁচে নেই। বহু স্টুডিও এখন হারিয়ে গেছে, যেগুলোতে বই-এর কাঠামো তৈরি হয়। ফলে পরিকল্পনা বিশবাঁও জলে। আশার আলো দেখছেন না অনেকেই। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর বেসরকারি সংস্থার কাজে নানা বাধা-নিষেধের বেড়াজাল তুলে পরোক্ষভাবে সংরক্ষণের কাজে বিস্তর বাঁধা তৈরি করছে। অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীর মতে, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার এই লড়াই পরোক্ষভাবে পরবর্তী প্রজন্মেরই ক্ষতি করছে। তাঁর মতে এর ফলে তারা এই সমস্ত সিনেমা থেকে বঞ্চি ত হচ্ছে। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার একাজের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করলেও তা কাজে লাগাতে পারছে না তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর। জানা গেছে, বেশ কিছু টাকা কাজ না হওয়াতে ফেরতও গেছে।

২৪ডিসেম্বরমালদারজনসভারআগেসংস্কারভারতীরস্থানীয়শিল্পীদেরসঙ্গীতপরিবেশন।

শব্দরূপ - ৪৯৩

ইন্দ্রনীল বৈরাগি

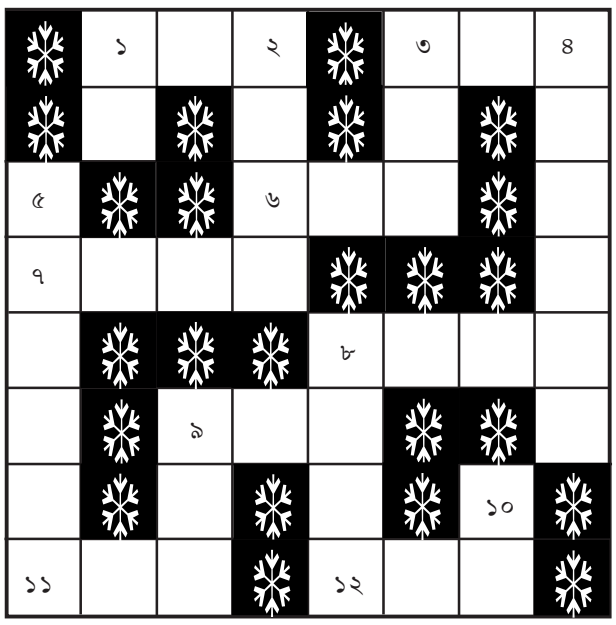

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. আরবি শব্দে মুহূর্ত বা অতি অল্প সময়, শেষ ঘরে মাতা, ৩. বিশেষণে সীমাযুক্ত,৬.ইঙ্গ শব্দ আবেদনাদির জন্য নির্দিষ্ট বিবরণপত্র বিশেষ, ৭.বিশেষণে বিবাহিত, একে-দুয়ে ডানাযুক্ত উপদেবী বিশেষ, ৮. বাড়ি তৈরির দুটি উপাদান, শেষ দুয়ে বালি, ৯. অরবি শব্দে সংকেত, আগাগোড়া পৃথিবী, ১১. বিশেষণে লেখা হয়েছে এমন, ১২. ব্যাধ, জেলে জাতি, শেষ দুয়ে আশীর্বাদ।

উপর-নীচ ঃ ১. একই শব্দে কেরোসিন ডিবা, লাফ, ২. অব্যয়ে অনুসর্গ অর্থে মধ্যস্থতায়, দুয়ে-চারে নিযুক্ত, ৩. বিমাতা, ৪. প্রবাদ প্রবচনে অরাজক দেশ, একে-তিনে নশ্বর, ৫. যে অন্যের ব্যাপারে অযাচিত ভাবে মাতববরি করে, দুয়ে-তিনে আপন নয়, চারে কাটারি, ৮. পাঞ্জাবের অন্তর্গত একটি নদী, প্রথম দুয়ে জল, ৯. কারবন বা অঙ্গার মিশ্রণে লোহা, ১০. সংকট, বিপদ, ভয়।

সমাধান শব্দরূপ ৪৯১

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
ভরত কুণ্ডু
কলকাতা-৬

কু	ম	রে	পো	কা	■	■	শ্রী
■	ব	■	■	লি	■	■	ধ
■	ল	■	■	কা	লে	ক্ট	র
সা	গ	র	■	■	প	■	■
■	■	ঙ্গ	■	■	চা	ম	ড়া
দাঁ	ড়ি	ক	মা	■	■	ই	■
ত	■	■	লি	■	■	কু	■
ন	■	■	শ	কু	নি	মা	মা

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সংখ্যায়।

পদবী-চোর নেহরু-গান্ধী ধারা ভারতপ্রেমিক হতেই পারে না

শিবাজী গুপ্ত

কিছুদিন আগে কংগ্রেসের উঠতি নেতা রাহুল গাঁধি ম্যাঙ্গালোরে এক সমাবেশে বলেছেন যে, পদবির মহিমাতেই রাজনীতিতে তিনি বাজিমাত করেছেন এবং অনেক প্রতিষ্ঠিত নেতাকে ল্যাং মেরে দলের শীর্ষস্থানে আরোহন করতে পেরেছেন।

রাহুল গাঁধি যদি তাদের এই 'গাঁধি' পদবি অর্জনের পূর্ব ইতিহাস জানতেন তাহলে নিশ্চয়ই আত্মশ্লাঘা অনুভব করতেন না; বরং লজ্জিত হতেন। কারণ, সে ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াত ও প্রতারণার ইতিহাস। পাঠকের জ্ঞাতার্থে তার যৎকিঞ্চি ৎ পরিচয় দেওয়া গেল।

জওহরলাল নেহরুদের পূর্বপুরুষ রাজ কাউল ছিলেন কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ অধিবাসী। মোগল আর শিখদের মধ্যে চলছিল মরনপণ সংগ্রাম। মোগল সম্রাট ফররুক শাহ কাশ্মীরে গেলে রাজ কাউল শিখগুরু গোবিন্দ সিং-এর গোপন আস্তানার খবর তাকে জানিয়ে দেয় বলে প্রকাশ। ফলে দু'জন গুপ্ত-ঘাতক পাঠিয়ে বিশ্রামরত শিখগুরুকে হত্যা করা হয়। পুরস্কার হিসাবে রাজ কাউলকে কাশ্মীর থেকে সরিয়ে এনে দিল্লীতে এক শহর বা খালের পাশে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। পরিচয় গোপন করার নিমিত্ত কাউল পদবি ত্যাগ করে রাজ কাউল খাল বা নহরের পাশের বাসিন্দা হিসাবে রাজ নেহরু নামে পরিচিত হলেন। তারই অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ হলেন জওহরলাল নেহরু। নেহরু বংশের মোগল প্রীতি ও শিখ বিদ্বেষের চাবিকাঠি মেলে এই ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে।

তারপরের ইতিহাস। সেই রাজ কাউল/নেহরুর বংশধর এলাহাবাদের মতিলাল নেহরু। তারই পুত্র জহরলাল নেহরু। মতিলাল নেহরুর সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল নওয়াব খান নামে এক সুন্নী মুসলমান মদ বিক্রেতার, ছেলের নাম ছিল ফিরোজ খান। পৈত্রিক পরিচয়ের সূত্রে এলাহাবাদে নেহরুদের আনন্দভবনে ছিল ফিরোজ খানের অবাধ যাতায়াত; এবং যথারীতি নেহরু-তনয়া ইন্দিরা নেহরু তার প্রতি আসক্ত হন এবং সাদি করতে গোঁ ধরেন। একজন মদ ব্যবসায়ী মুসলমানের পুত্রকে জামাই হিসাবে গ্রহণ করতে কমলা নেহরুর ঘোরতর আপত্তি ছিল। যা হোক কিছুদিনের মধ্যে মারা গিয়ে তিনি মনোকষ্ট থেকে রেহাই পেলেন। আর কি এক দুর্বোধ্য কারণে জওহরলাল ইন্দিরাকে ফিরোজ খানের সঙ্গে সাদি দিতে বাধ্য হন। তখন শুরু হয় আসল খেলা — দেশবাসীকে ধোঁকা দিতে ও বোকা বানাতে। আসরে অবতীর্ণ হলেন গান্ধী মহারাজ।

ফিরোজ খান ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু হয়ে ইন্দিরাকে বিয়ে করবেন না। আর ইন্দিরা তাকে বিয়ে করবেই — মুসলমান হতে হলেও, কার্যত তাই ঘটল। দেশে ফিরোজ ও ইন্দিরার মধ্যে "বৈদিক মতে" বিয়ের এক তামাসা অনুষ্ঠিত ও প্রচার হলো;কিন্তু — "The real marriage had taken place in a London mosque, Indira had changed to the Islamic faith to nikah Feroze, but did not want the people of India to know the facts."

সুতরাং ফিরোজ খানের সঙ্গে সাদি হবার পর আইনত ইন্দিরা নেহরুর

রাহুল গাঁধি যদি তাদের এই 'গাঁধি' পদবি অর্জনের পূর্ব ইতিহাস জানতেন তাহলে নিশ্চয়ই আত্মশ্লাঘা অনুভব করতেন না; বরং লজ্জিত হতেন। কারণ, সে ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াত ও প্রতারণার ইতিহাস।..... বদ-জাতদের লজ্জানুভব তো ন্যায়শাস্ত্র বিরোধী। যে বংশের ধমনীতে হিন্দু-মুসলিম-পার্শী-খৃস্টান — এই চার রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে, তারা দেশপ্রেমিক-ভারতপ্রেমিক হয় না, হয় ক্ষমতাপ্রেমিক — যেন তেন প্রকারেণ।

পদবি পরিবর্তন হয়ে 'ইন্দিরা খান' হওয়াই উচিত। কিন্তু মরতে 'ইন্দিরা গান্ধী' হলেন কেমন করে। রহস্য সেখানেই। শুরু হল ফিরোজ খানের কুলজী খোঁজা। তাতে জানা গেল ফিরোজ খানের পিতা নওয়াব খান সাদি করেন এক পার্শী মহিলাকে— অবশ্যই তাকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে। তাদেরই সন্তান হল ফিরোজ খান।

এখন, ইন্দিরা খানের ইসলামিয়ানা ঢাকা দেবার পালা শুরু হল। এ বিষয়ে সাহায্য করতে এলেন কৌশলী মহাত্মা গান্ধী। তিনি বললেন — পার্শীদের মধ্যে 'ঘ্যান্ধি' (Ghandhi) বলে একটা পদবি আছে — যেমন টাটা কোম্পানীর Mr. G.G.Ghandhi ছিলেন। ফিরোজের মা যখন মুসলমান হবার আগে পার্শী ছিলেন, তখন তার পদবি 'Ghandhi' থাকতেই পারে। ফিরোজ-তার পিতার খান পদবি ব্যবহার না করে মায়ের পদবি 'Ghandhi' ব্যবহার করলেই সব ল্যাঠা চুকে গেল। পদবি পাল্টালেও তার ধর্ম তো আর পরিবর্তন হচ্ছেনা। দেশের লোক Feroze Ghandi-কে পার্শী বলেই মনে করবে। এই সূত্রানুসারে Indira Khan ýËùò Indira Ghandhi দেশের লোক বুঝে গেল ইন্দিরার সঙ্গে মুসলমানের সাদি হয়নি, হয়েছে এক পার্শীর সঙ্গে।

অতি চালাক নেহরু ভাবলেন মেয়ের পদবি-তে আর পার্শীয়ান গন্ধ থাকবে কেন? 'Ghandhi' থেকে প্রথম 'ড়' অক্ষরটা ছেঁটে দিলেই তো বিশুদ্ধ গুজরাটি 'Gandhi' হয়ে একেবারে মহাত্মা গান্ধীর বংশকৌলীন্য পেয়ে যাবে। তার খান সাহেবের বিবি হওয়া ও ইসলামে দীক্ষা নেওয়া সব চাপা পড়ে যাবে। কার্যত তাই ঘটেছে, দেশের লোক ইন্দিরা গান্ধীকে মহাত্মার কন্যা বা নাতনি বলেই জানে।

তারপরে ইন্দিরা-ফিরোজের প্রথম পুত্র রাজীব গান্ধী —খানের বেটা হলেন নকল বা ভেজাল গান্ধী। বিলাতে পড়াশোনার নামে রকবাজি করতে গিয়ে এক হোটেল পরিবেশনকারী ইটালিয়ান মহিলা সোনিয়া- মাইনো'র প্রেমে মজে খৃস্টান হয়ে তাকে বিয়ে করেন। নাম হলো Rajiv Roberto Gandhi. এই রাজীব রবার্টো গান্ধী ও সোনিয়ার পুত্র হল রাহুল গান্ধী। খৃস্টান পিতামাতার সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চার্চে গিয়ে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। কিন্তু ব্যাঙাচির লেজের মতো নামের সঙ্গে গান্ধী পদবী ফেভিকল দিয়ে সেঁটেই রেখেছে। আর কপালে রক্তচন্দন ফোঁটা নিয়ে ভোট প্রচারে বেরিয়ে অজ্ঞ দেশবাসীকে বোঝাচ্ছে তারা কতো বড় হিন্দু। এদের গান্ধী পদবির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, ধর্মদ্রোহিতা ও ছলনা-প্রতারণা যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সেকথা জানলে এরা কখনোই তা নিয়ে গর্ববোধ করত না। বরং লজ্জা অনুভব করত।

কিন্তু বদ-জাতদের লজ্জানুভব তো ন্যায়শাস্ত্র বিরোধী। যে বংশের ধমনীতে হিন্দু-মুসলিম-পার্শী-খৃস্টান — এই চার রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে, তারা দেশপ্রেমিক- ভারতপ্রেমিক হয় না, হয় ক্ষমতাপ্রেমিক — যেন তেন প্রকারেণ।

'ইসলাম' এক সংগঠিত রাজনৈতিক তত্ত্ব

সংবাদদাতা।। ইসলাম রিলিজিয়ন নয়, আবার ধর্মবিশ্বাসও নয়। ইসলামের মধ্যে কোনও উপাসনা পদ্ধতি নেই। ইসলামে রয়েছে কিছু নীতি (?), কিছু রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক উপাদানের সংমিশ্রণ। আবার সামান্য কিছু ধার্মিক উপাদান অন্য সব উপাদানকে সরাসরি বিরোধিতা করে। দেখা যাক, ইসলাম তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই কথাটা কতটা প্রযোজ্য।

ইসলামের মধ্যে ধর্মভাবের পাশাপাশি রাজনীতি অর্থনীতি সামরিক প্রভৃতি দিকও রয়েছে।

মুসলিমদের মধ্যে দেখা গেছে তারা কোনও দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই, ইসলামি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিক্ষোভ শুরু করে। এই উদ্দেশ্য পূরণে তারা রাজনৈতিক শক্তি, সহনশীলতা ও সংস্কৃতির অপপ্রয়োগ করতেও কসুর করে না।

মুসলিমদের মধ্যে এই বিষয়টাও দেখা যায়, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে এমনকী যে কোনও দেশে তারা ২ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেই নিজেদের পছন্দসই জীবন যাপনের জন্য সংগঠিত হতে থাকে। ঠিক যেমনটি দেখা যাচ্ছে এই সমস্ত দেশগুলিতে —

যুক্তরাষ্ট্র	মুসলিম	০.৬ শতাংশ
অস্ট্রেলিয়া	মুসলিম	১.৫ শতাংশ
কানাডা	মুসলিম	১.৯ শতাংশ
ইতালি	মুসলিম	১.৫ শতাংশ
চীন	মুসলিম	১.৮ শতাংশ
নরওয়ে	মুসলিম	১.৮ শতাংশ

মুসলিমরা যখন ২ থেকে ৫ শতাংশে পৌঁছায় তখন অন্য মতাবলম্বীদের ধর্মান্তরকরণ করার একটা প্রচেষ্টা চালায়।

ডেনমার্ক	মুসলিম	২ শতাংশ
জার্মান	মুসলিম	৩.৭ শতাংশ
বৃটেন	মুসলিম	২.৭ শতাংশ
স্পেন	মুসলিম	৪ শতাংশ
থাইল্যান্ড	মুসলিম	৪ শতাংশ

যেদেশে মুসলিম জনসংখ্যা ৫ শতাংশ সেখানে মুসলিমরা জনসংখ্যার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে তারা হালাল ফুড ও কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করার দাবি জানাতে থাকে। যেমন ফ্রান্স, ফিলিপিন্স, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড ইত্যাদি।

ফ্রান্স	মুসলিম	৮ শতাংশ
ফিলিপিন্স	মুসলিম	৫ শতাংশ
সুইডেন	মুসলিম	৫ শতাংশ
সুইজারল্যান্ড	মুসলিম	৪.৩ শতাংশ
ত্রিনিদাদ-টোবাগো	মুসলিম	৫.৮ শতাংশ

এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তারা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ইসলামি তত্ত্বের শরিয়ত আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের ওপর চাপ তৈরি করতে থাকে। ইসলামের লক্ষ্যই হল সমগ্র বিশ্বে শরিয়ত আইন প্রতিষ্ঠিত করা।

মুসলিম জনসংখ্যা যখন ১০ শতাংশে পৌঁছায় তখন তাদের মধ্যে আইন শৃঙ্খলার তোয়াক্কা না করাটা নতুন ঘটনা নয়। এর জলজ্যান্ত উদাহরণ সম্প্রতি প্যারিসে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ। শুধু তাই নয়, ইসলামি তত্ত্বে সামান্যতম ঘা পড়লে, তারা বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করতেও পিছপা হয় না। মহম্মদের কার্টুন ও চিত্র নিয়ে যে বিক্ষোভ মুসলিমরা প্রদর্শন করেছিল তার সাক্ষী সমগ্র বিশ্ব। এই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি এই সমস্ত দেশগুলিতে —

গায়ানা	মুসলিম	১০ শতাংশ
ভারত	মুসলিম	১৩.৪ শতাংশ

ইজরায়েল	মুসলিম	১৬ শতাংশ
কেনিয়া	মুসলিম	১০ শতাংশ
রাশিয়া	মুসলিম	১৫ শতাংশ

যেখানে ২০ শতাংশ মুসলিম সেই দেশে প্রকাশ্যে জেহাদ কিছু অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে খুন, মন্দির ও চার্চে আগুন ধরানোর মতো ঘটনাও অসম্ভব নয়। সেখানে ইথিওপিয়ার নাম সর্বাগ্রে করা যেতে পারে।

ইথিওপিয়া ৩২. ৮ শতাংশ।

৪০ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মুসলিমরা নির্মম ভাবে হত্যাকাণ্ড, জঙ্গি হানার মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়।

বসনিয়া	মুসলিম	৪০ শতাংশ
চাদ	মুসলিম	৫৩.১ শতাংশ
লেবানন	মুসলিম	৫৯.৭ শতাংশ

৬০ শতাংশ বা বেশি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের ক্ষেত্রে মুসলিমরা কাফেরদের হত্যা করতেও পিছপা হয় না। মুসলিমরা শরিয়ত আইন, জিজিয়া কর প্রভৃতিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে।

এমন রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত হল —

আলবেনিয়া	মুসলিম	৭০ শতাংশ
মালয়েশিয়া	মুসলিম	৬০.৪ শতাংশ
কাতার	মুসলিম	৭৭.৫ শতাংশ
সুদন	মুসলিম	৭০ শতাংশ

৮০ শতাংশ মুসলিম যে দেশে রয়েছে যেখানে হিংসাত্মক ঘটনা, জেহাদ নিত্য - নৈমিত্তিক ঘটনা। এমনকী কাফেরদের হত্যাও অবিশ্বাস্য নয়। ৮০ শতাংশ মুসলিমের লক্ষ্যই থাকে সংখ্যাটা ১০০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া। যেমন —

বাংলাদেশ	মুসলিম	৮৩ শতাংশ
মিশর	মুসলিম	৯০ শতাংশ
গাজা	মুসলিম	৯৮.৭ শতাংশ
ইন্দোনেশিয়া	মুসলিম	৮৬.১ শতাংশ
ইরান	মুসলিম	৯৮ শতাংশ
ইরাক	মুসলিম	৯৭ শতাংশ
জর্ডন	মুসলিম	৯২ শতাংশ
মরক্কো	মুসলিম	৯৮.৭ শতাংশ
পাকিস্তান	মুসলিম	৯৭ শতাংশ
প্যালেস্তাইন	মুসলিম	৯৯ শতাংশ
সিরিয়া	মুসলিম	৯০ শতাংশ
তাজিকিস্তান	মুসলিম	৯০ শতাংশ
তুর্কি	মুসলিম	৯৯.৮ শতাংশ
সংযুক্ত আরব আমির শাহী	মুসলিম	৯০ শতাংশ

১০০ শতাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের ক্ষেত্রে সেদেশ মুসলিমদের কাছে দার উল ইসলাম বা দার এস সালাম। অর্থাৎ ইসলামের ঘর। যা তাদের কাছে পবিত্র। সেদেশই তাদের কাছে বড়। কারণ সেখানে সবাই মুসলিম। সেখানে মাদ্রাসাই সমস্ত কিছু। কোরাণ-ই সেদেশের কাছে সব। এইসব দেশগুলি হল — আফগানিস্তান, সৌদি আরব, সোমালিয়া ও ইয়েমেন। দেখা যাচ্ছে ১০০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলি থেকে দুর্ভাগ্যবশত শান্তি উধাও। মুসলিমদের রক্তের মধ্যেই যেন হিংস্র প্রবণতা মিশে থাকে।

একথা সর্বদা মাথায় রাখতে হবে ১০০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশে এরা বহাল তবিয়তে থাকে। সংখ্যালঘু ক্ষেত্রগুলিতেও তারা তাদের একটি নির্দিষ্ট এলাকা তৈরি করে নেয়। ১০০ শতাংশ হলেই তখন শরিয়ত আইন মেনে চলতে থাকে। তাদের তখন কোনও কোর্টে বিচার হয় না। এমনকী মুসলিমরা অবিশ্বাসী বা কাফেরদের শাস্তি হিসাবে মৃত্যু উপহার দেয়। কিছু দেশে ইমামই বেশি ক্ষমতাবান। কখনও বা সরকারেরও উর্দ্ধে। ভারতে ১.৫ শতাংশ মুসলিম ২২ শতাংশ জনসংখ্যায় পরিণত। তাদের জন্মহার হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন-র মতো অবিশ্বাসীদের থেকে বেশি। এই শতাব্দীতেই মুসলিমরা হয়তো বিশ্বে ৫৫ শতাংশ তে পরিণত হবে।

[সূত্র ঃ Slavery, Terrorism and Islam – Dr Peter Hammond]

Swastika
12 January - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

শীতশিবিরে সঙ্ঘস্থানে স্বয়ংসেবকদের সমাবেশ।

উদ্দীপনা জাগিয়ে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হল সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের শীতকালীন শিবির

দীপক গঙ্গোপাধ্যায় ।। বেজে উঠলো বিউগুল। ঝন ঝন করে বাজলো ঝঞ্ঝোরী। তালে তালে বাজতে শুরু করল আনক (সাইড ড্রাম), পনব (বিগ ড্রাম)। সেই তালেই অর্থাৎ রণবাদ্যের ছন্দে ছন্দে পা মিলিয়ে চলতে শুরু করলো শ'য়ে শ'য়ে তরুণ যুবক। রাস্তার দু' পাশে মায়েরা বাজাতে লাগলো শাঁখ, হল উলুধ্বনি। সঙ্গে পুষ্পবর্ষণ আর মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম', 'ভারত মাতা কী জয়' ধ্বনি। আশপাশ থেকে ছুটে আসতে লাগলো আবাল-বৃদ্ধ- বনিতা। সকলের চোখে মুখে আনন্দ উৎসাহ। মনে পড়ে গেল ১৯৬২-তে স্বাধীন ভারতবর্ষকে চীনের আক্রমণের কথা। চিন্তিত ছিল অপ্রস্তুত ভারতীয় সেনাবাহিনী, দ্বিধা-শঙ্কায় মুহ্যমান ভারতবাসী। তড়িঘড়ি জেনারেল কারিয়াপ্পা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর ওরফে শ্রীগুরুজীর সঙ্গে শলা-পরামর্শ করলেন। শ্রীগুরুজী সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের আহ্বান করলেন, দেশবাসীর মন উদ্দীপনায় উজ্জীবিত করতে। শ্রীগুরুজীর পথনির্দেশে স্বয়ংসেবকরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সঙ্ঘের রণবাদ্য (ঘোষ) সহ দেশ জুড়ে পথ সঞ্চলন (রুট মার্চ) করে দেশবাসীর মন সত্যিই উজ্জীবিত করেছিলেন। আনন্দিত তথা গর্বিত হয়েছিলেন জেনারেল কারিয়াপ্পা।

বীরভূম জেলার শীতশিবিরের সমারোপ উৎসবে ভাষণ দিচ্ছেন ডাঃ শচীন সিংহ। মঞ্চে অনিল দে (বাঁ দিকে) এবং শিবাজী মণ্ডল (ডান দিকে)।

সাম্প্রতিককালে সন্ত্রাসবাদে আক্রান্ত তথা জর্জরিত দেশ তথা বঙ্গবাসীর মনকে সেই একইভাবে পুনরুজ্জীবিত করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকরা। সঙ্ঘের সূত্র অনুযায়ী, দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, সঙ্ঘের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সাযুজ্য করে দেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী নিয়েছে সঙ্ঘের প্রতিটি রাজ্য শাখা। সেই যোজনার অঙ্গ হিসাবে উত্তরবঙ্গ যেমন সঙ্ঘের নাগরিক সমাবেশ, পথসঞ্চলনের কার্যক্রম করেছে, তেমনি দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি জেলায় তিনদিনের শীতকালীন শিবিরসহ পথ সঞ্চলনের কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের সঙ্ঘ যোজনায় মোট ২৭ জেলায় ২৭টি শীত শিবির সম্পন্ন হল। প্রতিটি শিবিরে সমাজের সর্বস্তরের বালক, তরুণ স্বয়ংসেবকরা নিজ খরচে উপস্থিত হয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা। ২৪ পরগণা ও হাওড়ায় একাধিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সব মিলিয়ে দশ হাজার তরুণ ও বালক স্বয়ংসেবক এবারের শীতকালীন শিবিরগুলিতে যোগদান করেছেন।

কলকাতা বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছে তিনটি শিবির — উত্তর বিভাগ, পূর্ব বিভাগ এবং দক্ষিণ বিভাগ। এই শিবিরগুলিতে ছয়শোরও বেশী স্বয়ংসেবক যোগদান করেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় তিনটি শিবিরে প্রায় এক হাজার স্বয়ংসেবক অংশগ্রহণ করেছেন। সব শিবিরগুলিই ১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগণার তিনটি শিবিরে প্রায় সাতশো স্বয়ংসেবক যোগদান করেছেন। মেদিনীপুর বিভাগের চারটি শিবিরে প্রায় এক হাজার স্বয়ংসেবক অংশ নিয়েছেন। এছাড়া বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, বর্ধমান, আসানসোল, বীরভূম, হাওড়া, হুগলি জেলাতেও এবার কয়েক হাজার স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গণবেশে যোগদান করেছেন। দক্ষিণবঙ্গের শিবিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দক্ষিণ মুর্শিদাবাদে ৬৩৫, নদীয়াতে ৫৩৪, ক্যানিং- এ ৫০১ জন। এই শিবিরের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে সঙ্ঘের প্রচার প্রমুখ সুব্রত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ক্যানিং-এ পাঁচশো স্বয়ংসেবকের পথ সঞ্চালনের পর কিছু সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বয়ংসেবকদের সাহায্যের জন্য নিজেদের অভিমত প্রকাশ করেন। হাওড়া, বসিরহাট ইত্যাদি স্থানগুলিতে পথ সঞ্চলনের পর স্থানীয় মানুষেরা এগিয়ে এসে সঙ্ঘ কাজের শ্রীবৃদ্ধিতে তাদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা থাকবে এমন অঙ্গীকার করেন। সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী হানা যে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের ভোটলিপ্সা তথা সংখ্যালঘু তোষণের পরিণাম, একমাত্র সঙ্ঘের কাজের প্রসারই যে এর একমাত্র প্রতিকার তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তারা জানান।

প্রতিটি শিবিরেই ভোর সাড়ে চারটায় জাগরণ ছিল। সারাদিন শারীরিক বৌদ্ধিক এবং অন্যান্য ধরনের সেবামূলক কাজের প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শেষে রাত দশটায় দীপ নির্বাপন হতো। প্রতিটি স্থানেই সমারোপ কার্যক্রমে এলাকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তথা সাধারণ মানুষকে শিবির দর্শনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। দক্ষিণবঙ্গে এই উপস্থিতির সংখ্যাটা ছিল পঞ্চাশ হাজার।

আন্দামানে সঙ্ঘের বালক শিবির

গত ২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর '০৮ পর্যন্ত আন্দামানের পোর্টব্লেয়ার শহরে সরস্বতী শিশু মন্দিরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শীতকালীন বালক শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ওই শিবিরে ২১ স্থান থেকে ১২১ জন বালক অংশ নেয়। শিবিরে ৮ জন শিক্ষক এবং ১০ জন প্রবন্ধক ছিলেন। শিবিরে আটুয়া পাটুয়া ও গোলক ধাঁধা খেলাতে বালকদের উৎসাহ ছিল দেখার মতো।

আন্দামানে শিবিরে বালকরা শারীরিক প্রদর্শনরত।

বর্গের উদ্বোধন কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের পূজ্যপাদ স্বামী হরিপদানন্দজী। উল্লেখ্য, বর্গে নগর সঙ্ঘচালক টি ভি আর এস শর্মা ও নগর কার্যবাহ ডাঃ অমিতাভ দে পুরো সময় উপস্থিত ছিলেন। শিবিরের মুখ্যশিক্ষক ছিলেন বিকাশ মন্ডল এবং শিবির কার্যবাহ অশোক কুমার।

দক্ষিণ অসমে সরসঙ্ঘচালক শ্রীসুদর্শনজীর পরিভ্রমণ

সংবাদদাতা ।। আগামী ৩০ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রী কে এস সুদর্শন দক্ষিণ অসমে পরিভ্রমণ করবেন। সরসঙ্ঘচালকজীর উপস্থিতিতে দক্ষিণ অসম প্রান্তের বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তাদের বৈঠক হবে। ৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীগৌরীর মাধব ধামে এবং ৪ ফেব্রুয়ারি শিলচরে সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের বৈঠক হবে বলে জানানো হয়েছে।

কলেজ ছাত্র সম্মেলন

মালদহে সরসঙ্ঘচালকজীর কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ২৬ ডিসেম্বর বিকেলে প্রায় সাতশ' কলেজ ছাত্রের এক সম্মেলন।

প্রকাশিত হচ্ছে ২৬ জানুয়ারি '০৯
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হচ্ছে ২৬ জানুয়ারি '০৯
প্রজাতন্ত্র সংখ্যা - ২০০৯
ষাট বছর পেরিয়ে গেলেও প্রকৃত অর্থে প্রজাতন্ত্র এখনও অনেক দূরে। প্রজাতন্ত্রের নামে যা চলছে তা অনেক ক্ষেত্রেই ধান্ধাবাজ রাজনীতি ও গুন্ডারাজ তন্ত্র। পেশী ও অর্থ বলের কাছে সন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষ। সেইসঙ্গে বারবার সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় আক্রান্ত আমরা, বিপন্ন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা। আক্রান্ত আমাদের বাঁচার অধিকার, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র। এই পরিস্থিতির পটভূমিতেই এবারের বিষয় —
আক্রান্ত প্রজাতন্ত্র
নিয়মিত সংখ্যার আকারেই প্রকাশিত হচ্ছে। দাম চার টাকা।
সত্বর কপি বুক করুন।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com